

লক্ষা ছুটি

('ম্যাট্রিক্স ইন দি প্যাসিফিক)

জুল ভের্ন

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রথম অঙ্কণা সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৬৪

প্রকাশিকা

অঙ্কণা বাগচী

অঙ্কণা প্রকাশনী

৭ ষুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

মুদ্রক

বিশ্বনাথ কবিরাজ

গঙ্গা মুদ্রণ

৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলকাতা ৪

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

दिव्येन्दु वन्द्यापाथ्याय
प्रीतिभाङ्गनेषु

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ
টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগ্‌স্, আওয়ার দি সী
স্ট্রিম হাউস
গভর্ন মরগান

১

অকুল পাথার

ঝড়ের রাতে

১৮৬০ সাল, তারিখ ২ই মার্চ।

সেদিন রাত এগারোটার সময় সীমাহারা এক মহাসমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়বাদল চলছিল। একে দুর্যোগের রাতের ভয়ানক অন্ধকার, তার উপর অমন ঝড়বৃষ্টি আর রাজ্যের ষত কুয়াশা! সে এমন নিরেট অন্ধকার যে মনে হয় যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে; মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ না চমকালে তাকে কোনো কালো দেয়াল ব'লেই বুঝি ভুল হ'তো। সেই অন্ধকারে এমনকি দু-হাত দূরের কোনো জিনিশ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই ঢেউ উঠছে উদ্দাম ও পর্বতপ্রমাণ, গ'র্জে উঠছে রাগে কতকগুলো প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মতো। একেকটা ঢেউ উঠছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্যের উপর, তার পর সহস্রটির হ'য়ে চারদিকে ফেটে পড়ছে।

আর এই ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্য দিয়েই একটা নিতান্ত ছোটো জাহাজ স্রোতের মুখে সামান্য কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল। মস্ত সব ঢেউ এসে জাহাজের উপর ভেঙে পড়ছে, তবু কেমন ক'রে যে জাহাজটি ভেসে আছে, সেটাই পরম আশ্চর্য। ঝড়ের দাপটে জাহাজখানা একবার ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণেই তীব্র স্রোতের মুখে প'ড়ে তীরের মতো ছুটে চলে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি একরত্তি জাহাজটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে।

সত্যি, জাহাজটা একরত্তি একটা দু-মাছলওলা স্কুনার। এ-রকম স্কুনার কখনও মহাসমুদ্রে পাড়ি জমায় না, ছোটো-ছোটো সমুদ্রের উপকূল ধ'রেই চলাফেরা করে। কেমন ক'রে যে এটা এই স্বদূর মহাসাগরে এসে পড়েছে তা এই জাহাজের আরোহীরা পর্যন্ত ভালো ক'রে জানে না। আর আরোহীরাও বেশ একটু অসাধারণ: জাহাজটা যেমন ছোটো, তেমনি এর আরোহীরাও নিতান্তই ছেলেমানুষ।

জাহাজের পিছনের দিকে একান্ত অসহায়ের মতো চূপ ক'রে বসে ছিল তিনটি ছেলে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো তারই বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। অন্য দু'জনের বয়স আরো কম—বোধ করি তেরো হবে। এই তিনজন ছাড়া জাহাজের চাকার কাছে বসে ছিলো আরেকজন; সে নিউজীল্যান্ডের আদিম অধিবাসী মাওরিদের ছেলে। তারও বয়স মাত্র তেরো বছর। এই চারটি ছেলে মিলে প্রাণপণে জাহাজটিকে ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলো। প্রতি মিনিটেই একেকটি পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে, আর সেই সাহসী মাওরি ছেলেটি অসীম চেষ্টার সঙ্গে ঠিকভাবে হাল ধ'রে থেকে ঢেউ কেটে চলতে থাকে। হালখানা যে কেন এখনও খুলে গেল না, তা-ই আশ্চর্য!

রাত দুটোর পর থেকে ঝড়, জল আর ঢেউয়ের প্রতাপ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো। একেকটা ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, আর ছেলেরাও ছড়মুড় ক'রে ডেকের উপর শুয়ে পড়ে। ছেলেদের মনে অপরিসীম সাহস বলতে হবে। নইলে সাধারণ ছেলে হ'লে এতক্ষণে হয়তো ভয়েই ম'রে যেতো। তাছাড়া যদি ঠিকভাবে ধ'রে থাকতে না পারতো তো এতক্ষণে জাহাজ সোজা সমুদ্রের নিচে চ'লে যেতো।

এখানে ছেলে ক-টির নাম ব'লে নেওয়া ভালো। প্রথম তিনটির ছেলের নাম যথাক্রমে ব্রিয়ঁা, গরডন আর ডোনাগান। মাওরি ছেলেটির নাম মোকো।

ছেলেদের মুখে অনেকক্ষণ ধ'রে কোনো কথা নেই। হতবাক হ'য়ে তারা ঝড়ের সেই তাণ্ডব দেখছিলেন। আচমকা কোনো আঘাত পেলে যেমন প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই অনুধাবন ক'রে দেখার অবস্থা থাকে না, এদের দশাও এখন ঠিক তেমনি। ভিতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে—এখনও যে ঝড়ের সঙ্গে তারা যুদ্ধ ক'রে চলেছে, তা কিন্তু কোনো-কিছু অনুধাবন না ক'রেই—কেবল যেন অভ্যাসবশত, হাত-পাগুলো নড়ছে যেন কলের পুতুলের মতো।

অনেকক্ষণ পরে প্রথম কথা বললো গরডন। ব্রিয়ঁাকে সে শুধু জিগেস করলে, 'জাহাজ চলছে না থেমে আছে কিছুই যে বুঝতে পারছি না, ব্রিয়ঁা!'

ব্রিয়ঁার বয়স চোদ্দ বছর—সে-ই সকলের চেয়ে বড়ো। গম্ভীরভাবে সে গরডনের কথার উত্তর দিলে, 'জাহাজ চলছে ব'লেই তো মনে হচ্ছে—এ কেবল ঢেউয়ের ঢলুনিই নয়। ডোনাগান, খুব সাবধান, সামনে কিন্তু প্রকাণ্ড এক ঢেউ! মোকো, মোকো—দেখো—জাহাজের মুখ যেন ঠিক থাকে!'

ব্রিয়ঁার কথা শেষ হবার আগেই মস্ত একটা ঢেউ জাহাজের উপর এসে

সারেঙের চাকা ধরে বসে ছিলো মোকো—কেমন করে যে সে উঠলো, আঘাত সামলে উঠলো, তা এরা কেউ জানে না—নিজেই হয়তো তা জানে না, মোকো—কিন্তু তারই দক্ষতায় জাহাজ সেই ডেউ কেটে ডেসে উঠলো। পরমুহুর্তেই ডেকের একটা কামরার দরজা খুলে ছুটি নতুন বৃথ বেরিয়ে এলো। তারাও বয়সে নিতান্তই ছেলেমানুষ—সত্যি বলতে, বরং এদের চেয়েও ছোটো। তাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর ছিলো, ভয়ে সে লাজটাকে পিছনের পায়ে মध्ये গুটিয়ে নিয়ে একবার কেবল ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো। তাদের দেখেই ব্রিয়ঁ চোঁচিয়ে বলে উঠলো, ‘ইভারসন! ডোল! তোমরা বাইরে এসেছো কেন? যাও, শিগগির ঘরের ভেতর চ’লে যাও! ডোল, বাগডে যেয়ো না, কোনো ভয় নেই। যাও, চোখ বুজে ভেতরে ব’সে থাকো গে, যাও।’

ব্রিয়ঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা ডেউ শব্দে জাহাজের পাশে এসে ভেঙে পড়লো। একবার কাত হ’য়েই জাহাজটা আবার সোজা হ’য়ে উঠলো, আর অর্মান আবার ঘরের দরজা খুলে আর একটা ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটির নাম বাস্কার : বয়সে আগের ছেলেটির চেয়ে একটু বড়ো বটে, কিন্তু ব্রিয়ঁ আর গবডনের চেয়ে সে ছোটো। বাস্কার বাইরে এসে অন্ধকারের মধ্যে চীৎকার করে জিগেস করলো, ‘ব্রিয়ঁ, আমি কি খামকা ভেতরে ব’সে না-থেকে তোমাদের ওখানে গিয়ে সাহায্য করবো?’

ব্রিয়ঁ চোঁচিয়ে উত্তর দিলে, ‘না বাস্কার, তুমি ভেতরেই যাও, তোমার সাহায্যের এখন কোনো দরকার নেই। আর ক্রস, ওয়েব, সার্ভান্স, উইলকক্স—তোমরা সব ভেতরে ব’সে কী করছো? ছোটোবা যে ভয়ে কাঁদছে। তোমরা ক’ক ওয়েব একটু খাময়েও বাখতে পারছো না?’

ব্রিয়ঁর থেকে অবিগ্ন কোনো উত্তর এলো না, এবং বাস্কারও কোনো স্বীকৃতি না-ক’রে আবার কামবাব মধ্যে প্রবেশ ব’বে শব্দে দরজা বন্ধ ক’রে দিল।

আশ্চর্য! এই স্বদূর মহাসমুদ্রে, এই ঝড়-গর্জনে! অন্ধকার মধ্যরাতে এতগুলো ছেলেমানুষ কোথেকে এলো? জাহাজেব যাত্রীবা যে সবাই এমনাকি বালকও নয়—কেউ কেউ যে আরো ছোটো।

আরোহীদের সংখ্যা সবস্বল্প পনেরো : বাইরে চারজন, আর কামবাব ভিতরে এগারো। এই পনেরোজন ছোটো ছেলে ছাড়া জাহাজে আর কোনো পুরুষ বা স্ত্রী কোনো নাবিক নেই। তার উপর আরো আপসোসেব কথা এই যে,

ছেলেদের মধ্যে একজনও জাহাজ চালানোর অ-আ-ক-খ-ও জানে না। অথচ জাহাজটি নিয়ে তারা কিনা একেবারে সীমাহারা মহাসমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছে! তার উপরে তারা আবার আদৌ জানেই না পৃথিবীর কোন অংশে এখন তাদের জাহাজ চলছে। শুধু এইটুকুই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এক মহাসমুদ্রের উপর এসে পড়েছে—তাও আবার যে-সে সমুদ্র নয়, একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর!

প্রশান্ত মহাসাগর। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের এক উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আরেক উপকূল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই ছয় হাজার মাইলব্যাপী নীলকান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে কেমন ক'রে এসে পড়লো এই অদ্ভুত জাহাজটা? জাহাজের অন্তিম লোকজন ও নাবিকদেরই বা কী হ'লো? তারা কি ঢেউয়ের মুখে পড়ে ভেসে গেছে? না কি কোনো জলদস্যুর হাতে প'ড়ে এদের এমন চূর্ণা হয়েছে? আর, এই জাহাজটা বা কোন দেশের? জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে তখন হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কোন বন্দর থেকে এসেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়াই কেন, প্রশান্ত মহাসাগরে তো জানা-অজানা দ্বীপের কোনো অভাব নেই—তাদেরই কোনো-একটা বন্দর থেকে যে জাহাজটা আসে-নি, তাই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া, এমনিভাবে কদিন ধ'রে সমুদ্রের উপর ভাসছে জাহাজটা?

সমুদ্রের এই অংশটা অত্যন্ত নিরাল—বোধহয় এখন দিয়ে কোনো জাহাজ যায় না। অন্তত কোনো দিকেই তো কোনো জাহাজ, সীমার বা জনমানবের চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তাই ত্রিয়' আর বন্ধুরা জাহাজটিকে প্রাণপণে সামনের দিকেই চালিয়ে নিচ্ছিলো, আরো কিছুদূর গেলে যদি কোনো ডাঙার চিহ্ন মেলে।

রাত্রি ক্রমশ গভীর হ'তে লাগলো আর এরই মধ্যে অকস্মাৎ সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে আরেকটি তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডোনাগান চীৎকার ক'রে উঠলো, 'জাহাজের সামনের মাস্তুলটা ভেঙে পড়লো!'

তার কথার প্রতিবাদ করলো মোকো। বললে, 'মাস্তুল ভাঙেনি, মাস্তুলের বড়ো পালটা কঁশে গিয়েছে!'

তৎক্ষণাৎ ত্রিয়'র কর্কশ শব্দ শোনা গেলো, 'গরডন, তুমি শব্দ ক'রে হাল ধ'রে থাকো। আর মোকো ও ডোনাগান—তোমরা দু'জনেই শিগগির আমার সঙ্গে এসো। পাল কঁশে যাওয়ার জাহাজ হয়তো একুনি বানচাল হ'য়ে যাবে। দেখো, অকস্মাৎ ঢেউয়ে ভেসে যেয়ো না—সাবধান, ধ'রে-ধ'রে এসো।'

ত্রিয়ঁ আর মোকো ছাড়া এদের মধ্যে আর কেউই সমুদ্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। ভরসা যা-কিছু তা কেবল এই দু'জনেরই উপর। ত্রিয়ঁ আর মোকো কুড়ুল দিয়ে ভাঙা মাঙ্গলটাকে কেটে নামিয়ে ফেললো। অঙ্ককারের মধ্যেই পালগুলো আর লোহার তারগুলো তারা কোনোরকমে একদিকে সরিয়ে রাখলো। বড়ো মাঙ্গলটুকি অনেক জায়গাতেই ভেঙে গিয়েছিলো—এখন ষা রইলো, তা নিতাস্তই ছোটো। কিন্তু তাতেই কোনোরকমে পাল খাটিয়ে তারা জাহাজের গতি ঠিক রাখবার চেষ্টা করলে।

এতক্ষণ মনে অন্তত ষেটুকুও আশা ছিলো, বড়ো মাঙ্গলটুকির অকেজো দশা দেখে ত্রিয়ঁ'র মনে এখন আর তার লেশমাত্রও রইলো না। কিন্তু সে-ই ষেহেতু বয়েসে সকলের চেয়ে বড়ো, সেইজন্য ছোটোদের নির্ভয়ে রাখার দায়িত্বটা স্বভাবতই তার উপরেই এসে বর্তেছিলো—ভয়ে সবাই কেমন জুজু হ'য়ে গিয়েছে দেখে সে নিজেই কাঁধের উপর সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলো। তাই ত্রিয়ঁ আর তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ না-ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে ছোটো মাঙ্গলগুলোয় পাল খাটাবার ব্যবস্থা করলে।

আর সেই ভাঙা মাঙ্গল আর ছেঁড়া পাল নিয়েই জাহাজটা ঝড়ের মুখে তীরের মতো পুর্বদিকে ছুটে চললো। 'তবু রক্ষা, স্কনারটা খুবই মজবুত ছিলো,' মনে-মনে ভাবলে ত্রিয়ঁ, 'না-হ'লে এতক্ষণে ষে কী হ'তো ' ত্রিয়ঁ আর-কিছু ভাবতে চাইলো না। অঙ্ককার একটুও কয়েনি। আকাশও মেঘলা হ'য়ে আছে। ঝড় যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে—কস্মিনকালেও ষে এই তাওব থামবে, তার কোনো লক্ষণ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কখনও-কখনও শোনা যাচ্ছে সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ আর্ত স্বর। পাখির ডাক যখন শোনা যাচ্ছে তখন ভাঙা কি কাছেই? না, সেইটাও অনুমানও করা যায় না। কারণ ত্রিয়ঁ তার জ্ঞানবুদ্ধি ও অধ্যয়ন দিয়ে জানে ষে এই সব সামুদ্রিক পাখিদের অনেক সময় ভাঙা থেকে কয়েকশো মাইল দূরের সমুদ্রেও দেখা যায়।

ছোটো মাঙ্গলে পাল খাটিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার জোরে একটা শব্দ হ'লো। বাকি পালগুলোও বুঝি কৈশে গেলো!

ডোনাগান হতাশ গলায় বললে, 'ষাক, আপদ গেলো! আর কোনো পালও আস্ত নেই, আর রক্ষাও নেই!'

'ভয়ের কিছু নেই, ডোনাগান,' বললে ত্রিয়ঁ। 'সে ষে নিজে ভয় পায়নি ষ, কিন্তু তবু সে তাকে আশ্বাস দিতে চাইলো—আনন্দে বোধহয় নিজেকেই

তার আশ্রয় করার দরকার ছিলো। বললে, 'ঝড়ের যেমন বেগ আর সমুদ্রের যেমন স্রোত, তাতে আমাদের জাহাজ এখনও বেশ জোরেই চলবে। তবে আগের মতো জোরে নয়, এই যা।'

এমন সময় মোকো চোঁচিয়ে উঠে তিনজনকে সাবধান ক'রে দিলো : 'সাবধান ! খুব সাবধান ! ঢেউ আসছে !'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ! তক্ষুনি সবাই শুয়ে প'ড়ে হাতের কাছে যে যা শক্ত জিনিস পেলো তাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকলো। সব লগুভগু ক'রে ঢেউ চ'লে গেলে পরে দেখা গেলো, জাহাজের ভাঙা মাস্তুলের অংশ ও অন্যান্য কাঠ সমস্তই ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে আরেকটি জিনিশও অদৃশ্য হয়েছে—সে মোকো। মোকোকে আর ডেকের উপর দেখা গেল না।

ত্রিয়'র হৃৎপিণ্ড যেন ধ্বংস ক'রে লাফিয়ে উঠলো ! 'মোকো ! মোকো ! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিলে সে।

ডোনাগানও লাফিয়ে উঠলো, 'কী সর্বনাশ ! মোকো কোথায় গেলো ?'

পাগলের মতো চ্যাঁচাতে লাগলো তিনজনে। কিন্তু কোনো দিক থেকে মোকোর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। 'গরজন,' ত্রিয়'র গলার স্বর ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, 'যেমন ক'রেই হোক ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে ! শিগ'গির সমুদ্রে একটা লাইফ-বোট ফেলে দাও ! আর ডোনাগান, তুমি একটা লম্বা দড়ি ফেলে দাও সমুদ্রে !'

ভীত ও উত্তেজিত গলায় তারা ডাকতে লাগলো, 'মোকো ! মোকো !'

এমন সময় হাওয়া আর ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে অতি ক্ষীণ একটি আর্ত স্বর ভেসে এলো : 'বাঁচাও—বাঁচাও !'

আর্তনাদ শুনে ত্রিয়' তক্ষুনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি ! কিন্তু গরজন তাকে আটকালো ;—বাধা দিয়ে বললে, 'কোথায় মোকো ? ও-শব্দ তো সমুদ্র থেকে আসছে না !'

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো ত্রিয়' : স্পষ্ট মোকোর গলার স্বর : 'বাঁচাও, বাঁচাও !' ঝড়ের আর ঢেউয়ের শব্দ যে-রকম ভীষণ, তাতে মোকো যে কোথেকে ডাকছে, তা সহজে বোঝা গেলো না। আন্দাজে ভর ক'রে ত্রিয়' কোনোরকমে জাহাজের স্মৃগদিকে এগোতে থাকলো। শেষে দেখা গেলো, জাহাজের সামনের দিকে এক গলুইয়ের ভিতর মোকো আটকে রয়েছে ঢেউয়ের দ্বায়ে শেষটার সে নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়তো, কিন্তু জাহাজের

আটকে গিয়েছিলো—ঠিক আটকে অবিশ্রি যায়নি, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলো বরং বলা যায়—হাত ফসকে গেলে যে কী সর্বনাশ হ'তো তা ব্রিয়'ী কল্পনাও করতে চাইলো না।

ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হ'লো। দেখা গেলো, একটা প্রকাণ্ড পিপে সেই গলুইয়ের মধ্যে ঢুকে মোকোকে চেপ্টে ধরেছে। তখন বহু কষ্টে সেই পিপেটাকে সরিয়ে তিনজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে তাকে গলুইয়ের ভিতর থেকে বার ক'রে আনলে। ঝোড়ো কাকের দশা তখন মোকোর, চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু যে হাঁফ ছাড়বে, তারই বা সময় কই? পিছনে তখন একটার পর একটা ঢেউ আসছে। তাই সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ফের হাল ধ'রে বসলো।

ভোর পাঁচটার সময়ে ঝোড়ো সমুদ্রে ফিকে একটু আলোর রেখা ফুটলো। আর তেমন অন্ধকার নেই বটে, কিন্তু চাপ-চাপ কুয়াশার দরুন তখনও আধ মাইলের বেশি দূরের জিনিশ চোখে দেখা যায় না। আশ্বে-আশ্বে বেলা যত বাড়লো, আলোর রেখাও ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো। মেঘ তখনও আছে, তবে ঝড়ের প্রতাপ আর তেমন নেই। কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র তখনও কেমন ঝাপসা আর নির্মম। চারজনে বসে অপলক নয়নে প্রকৃতির সেই ধূসর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ সারেঙের চাকার কাছ থেকে মোকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডাঙা! ডাঙা! ওই ঝাখো, ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মোকোর চীৎকার শুনে তিনজনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, সত্যিই দূরে, পূবদিকে দিগন্তের প্রান্তে ক্ষীণ একটি ঘনশ্যামল রেখা ফুটে উঠেছে। আকাশ এত মেঘলা, আর চারদিকে কুয়াশাও এত চাপ বেঁধে আছে যে সত্যি-সত্যি বোঝা গেলো না ওই ঘনশ্যামল রেখাটা আসলে কী—ডাঙা, না মেঘ।

ছরবিন তুলে নিয়ে চোখে লাগালো ব্রিয়'ী। ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে শেষকালে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ, সত্যিই পূবদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মিনিট পনেরো পরে দিগন্তের সেই সবুজ রেখাটা আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, ততক্ষণে আশ্বে-আশ্বে সরতে শুরু করেছে কুয়াশা। জাহাজও হাওয়ার ধাক্কায় পূবদিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ততক্ষণে। ব্রিয়'ী আবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ঘোষণা করলো, 'ডাঙা! পূবদিকে স্পষ্টই ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

'ডাঙা যে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' গরডনও সায় দিলে, 'কিন্তু বড়ো নিচু জরি ব'লে মনে হচ্ছে।'

নিচুই হোক আর উচুই হোক, ওই শামল রেখাটি যে ডাঙা, কালো মাটি ও সবুজ গাছপালার দেশ—এইটুকুই ওদের কাছে যথেষ্ট। প্রায় দু-মাইল দূরের এক স্থলভূমি তার ঘন বনানী নিয়ে ছেলেদের দিকে যেন সশ্বেছে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। এতদিন তারা যেন জানতেই পারেনি মাটি, গাছপালা, আলো-হাওয়া কী অসীম সুন্দর! যেভাবে জাহাজটা ছুটছে, তাতে মনে হয় আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সেই ডাঙার উপর গিয়ে পড়বে।

আধ ঘণ্টা পরে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখা গেলো তীর। উপকূলের ঠিক পিছনেই সার বেঁধে উঠেছে পাহাড়—প্রায় দুশো ফুট উচু। আর সেই পাহাড়ের নিচেই শামল সমতল ভূমি। আর তারই কোণ ঘেঁষে আবছা দেখা যায় বেলাভূমির হলুদ বালি। জাহাজ সোজা সেই বালির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন দ্বীপের সামনেটায় কোনো প্রবাল-প্রাচীর বা কোর্যালরীফ না-থাকলেই সর্ব রক্ষে।

গরডন, ডোনাগান আর মোকোকে জাহাজ সামলাবার ভার দিয়ে ব্রিয়'ী গিয়ে জাহাজের সামনের দিকের ডেকের উপর দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে সেই ডাঙার আশপাশে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দেখা গেলো না যেখানে জাহাজ ভেড়ানো যায়। সুবিস্তৃত বালির রাজ্যের এদিকটায় সমুদ্র-জল থেকে মাথা তুলেছে মস্ত এক প্রবাল পর্বত। প্রবালের সেই দেয়ালের গায়ে গিয়ে তুমুল শব্দ ক'রে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না—তক্ষুনি জাহাজ চুরমার হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ভীতচকিত চোখে তাকিয়ে ব্রিয়'ী আবিষ্কার করলো, কোন-এক অমোঘ টানে জাহাজ কেবল সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ মহাসমুদ্রে বাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েও সে কিছুতেই আশা হারায়নি—কোথায় যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উদ্ধার তারা কখনও না কখনও পাবেই। কিন্তু এখন সেই ভয়ংকর প্রাচীর দেখে তার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে সে সবাইকে বললো ব্যাপারটা, তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করলো জাহাজের মুখ ফেরাতে। কিন্তু পবন আর বক্রণ এই দুই আদি দেবতাই যেন বিমুখ তাদের উপর—ঢেউয়ের ধাক্কা আর হাওয়ার তোড়ে জাহাজ সোজা সেই প্রবাল-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো—লোহাকে যখন চুষক টান দেয় তখন যেমন হয়, ঠিক তেমনি যেন ওই প্রবাল-প্রাচীর জাহাজটাকে টান দিয়েছে।

সেইজন্যই সকাল যখন ঠিক ছটা, তখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে প্রচণ্ড

নির্নাদ ক'রে সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লো জাহাজ। ভয়ে ওরা তখন কঁকড়ে গিয়েছে, শিউরে উঠে আপনা থেকেই চোখ বুজে ফেলেছে—কে কোথায় ছিটকে পড়বে, কে জানে! কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! জাহাজ মোটেই চুরমার হ'য়ে গেলো না—প্রবাল-প্রাচীরের সামনেকার সেই ভয়ানক ঘূর্ণির মাঝখানে বোঁ ক'রে চর্কির মতো একবার ঘুরপাক খেয়েই হঠাৎ কেমন ক'রে যেন কিসের গায়ে আটকে গিয়েছে।

না, জাহাজ পাহাড়ের গায়ে আছাড় খায়নি, তলাকার বালির মধ্যে আটকে গিয়েছে। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জগ্গ, তারপরেই জাহাজটা আবার থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো একবার : পিছন থেকে আরেকটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে আরো কিছু দূরে ঠেলে নিয়ে গেলো। সেখানে নিরেট পাথরের শ্রেণীর মধ্যে জল ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে কেবল—জাহাজ সেই ঘূর্ণিজলে কাঁত হ'য়ে পড়লো।

সামনের বেলাভূমি তখন মাত্র সিকি মাইল দূরে। এটুকু পথ এখন পেরোতে পারলেই হয়। কিন্তু এই ঘূর্ণিজলের মধ্যে দিয়ে কী ক'রে তারা তীরে গিয়ে উঠবে?

ঢেউ এলো

কুয়াশার পর্দা আর নেই তখন, কিন্তু ঝড়ের বেগ ও সমুদ্রের উত্তালতা তখনও তেমন কমেনি। অল্প দূরেই সেই অস্ফীত রহস্যময় স্থলভূমি : প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সে কি কোনো দ্বীপ, না দেশ—তা কিছুই জানা নেই।

ত্রিয়ঁ আর গরডন জাহাজের নিচের ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো। ঘণ্টা দু-এক কেটে গেলে পর ত্রিয়ঁ হঠাৎ এক সময় বললে, 'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই বোধহয় ঝড় থেমে যাবে, সমুদ্রের ঢেউও শান্ত হ'য়ে যাবে। তাছাড়া তাঁটার টানে জলও সরে যাবে আশ্বে-আশ্বে। তখন আমরা সামনের ডাঙার দিকে যাবার চেষ্টা করবো।'

'অপেক্ষার আর দরকার কী?' ডোনাগান প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'আমরা তো এখুনি তীরে যাবার উদ্যোগ করতে পারি।'

ডোনাগানের কথায় সায় দিয়ে উঠলো আরেকটি ছেলে : তার নাম

উইলকল্প, বয়েস বারো বছর। ‘ঠিক কথা,’ বললে সে, ‘আবার ও-সব অপেক্ষা করা-টরা কেন? এখুনি একবার চেষ্টা ক’রে দেখা যাক।’

আসলে ছেলেদের মধ্যে ডোনাগানের তিনজন অস্থির ছিলো—তাদের নাম ক্রস, ওয়েব আর উইলকল্প। ফরাশি ব’লে ত্রিয়ঁকে তারা দেখতেই পারতো না। এই চারজন ছাড়া জাহাজের অন্য সব ছেলেই কিন্তু ত্রিয়ঁকে বেশি পছন্দ করে। আসলে অন্য সবাই ত্রিয়ঁকে পছন্দ করে বলেই ডোনাগানের তীব্র ঈর্ষা—সেইজন্যই সে সব সময় ত্রিয়ঁর কথার প্রতিবাদ ক’রে থাকে—তাতে তার কথায় যুক্তি থাক বা না-থাক, সে তার পরোয়া করে না।

ত্রিয়ঁর যুক্তিসিদ্ধ কথা অগ্রাহ্য ক’রে ডোনাগান ও তার সালোপাঙ্গরা জাহাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জাহাজ থেকে মূল ডাঙার দূরত্ব মাত্র সিকি মাইল বটে, কিন্তু যে-রকম প্রবল ঢেউ আর ঘণি, তার উপর কঠিন বন্ধুর প্রবালশ্রেণী তাদের চোখে পড়লো যে সে-সবের উপর দিয়ে নৌকো চালাতে তখন তাদের আর সাহসে কুলোলো না। তবে মুখে তারা সে-কথা আদৌ প্রকাশ করলে না, বরং এমন বাস্তবমুস্ত ভাবভঙ্গি করতে লাগলো যে যেন তারা তক্ষুনি রওনা হ’য়ে পড়বে।

ত্রিয়ঁ ভালো মনে ক’রে আরেকবার তাদের বারণ করতেই ডোনাগান একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, ‘তুমি এত উপদেশ দেবার কে? আমরা যা ভালো বুঝি তাই করবো—তোমাকে কেউ ফোপরদালালি করতে ডাকেনি।’

ত্রিয়ঁর মুখচোখ অপমানে একটু রাঙা হ’য়ে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সে সামলে রাখলো। সে-ই তো সকলের বড়ো—কথায়-কথায় মেজাজ খারাপ করলে তার চলবে কেন? তাছাড়া ডোনাগান তাকে মুখে দু-কথা শুনিয়ে দিলে বটে, কিন্তু যাবার কোনো লক্ষণই দেখালো না। তার ওই মিথ্যে অহংকার দেখে ত্রিয়ঁর বরং একটু হাসিই পেলো। হাসি চেপে সে একপাশে সরে গেলো। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেয়ার মতো অবসরও অবশ্য তার ছিল না। কারণ সামনের ওই স্থলভূমি আসলে কোনো ছোটো দ্বীপ না মহাদেশের অংশ, তা-ই এখনও জানা যায়নি।

স্থলভাগের দু-দিকে দুটো অস্তরীপের মতো। উত্তর ভাগ উঁচু, বন্ধুর ও পর্বতবহুল, দক্ষিণ ভাগ নিচু ও সমতল। যদি এটা সত্যিই কোনো দ্বীপ হয়, আর দ্বীপটা যদি একেবারে উষর মরুভূমির মতো মরা ধুলোয় ভরা থাকে, যদি পুরো দ্বীপটাই বক্ষা ও অক্ষুব্ধ হয়, তাহ’লে এতগুলো ছেলে কী খেয়ে বাঁচবে?

দেশে ফিরবেই বা কেমন ক'রে ? আর যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তবে অবিশিষ্ট অনেকটা নিরাপদ। এখানে না-হোক, কিছু দূরে নিশ্চয়ই লোকালয় পাওয়া যাবে। কিন্তু অঞ্চলটা মহাদেশের এমন কোনো অংশও তো হ'তে পারে যেখানে আশপাশে মানুষজনের বসতি নেই, আছে কেবল শত-শত বুনো জানোয়ারের ভয়াবহ বাসস্থান !

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। আপাতত ডাঙায় পৌছনো যায় কী ক'রে সেটাই প্রধান বিবেচ্য।

অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে চারদিকে নিরীক্ষণ করলো ত্রিয়ণী। কিন্তু কোথাও মানুষের কোনো বসতি দেখা গেলো না, এমনকি একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত না। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ নিস্তেজ গলায় আপন মনেই সে বললে, 'কোথাও যে ধোঁয়াও দেখা যায় না একটুও !'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মোকো। সে বললে, 'নদী রয়েছে, কিন্তু নদীতে কোনো নৌকো বা ভেলা নেই।'

'লোক না-থাকলে ধোঁয়াই বা উঠবে কোথেকে,' ডোনাগানের তির্যক মন্তব্য শোনা গেলো, 'আর নৌকোই বা আসবে কোন চুলো থেকে ?'

লোক না-থাকার মানে যে কী, সেটা ডোনাগানের মাথায় ঢুকেছে কি না ত্রিয়ণী বুঝতে পারলো না। হয়তো তাদের অবস্থার গুরুত্ব এখনও তার মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু ত্রিয়ণী আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

আস্তে-আস্তে সমুদ্রে ভাঁটা দেখা দিলো। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। ত্রিয়ণী গোড়াতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো যে ভাঁটার সুষোগে ডাঙায় গিয়ে উঠবে। এবার জল সরতে শুরু করতেই গরডন, বাস্ফটার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে জাহাজের খোল থেকে দরকারি জিনিশপত্র সব বার ক'রে ডেকের উপর নিয়ে আসতে লাগলো। জাহাজে জিনিশও কম ছিলো না। হরেকরকমের খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিশপত্র একেবারে প্যাক-করা বাক্সে বন্ধ ছিলো। আগে সেগুলোকে সাবধানে ডাঙায় নিয়ে যেতে হবে : বাকি জিনিশপত্র পরে নিলেও চলবে।

জাহাজে নৌকো ছিলো মাত্র একটা, বাকি সবগুলি ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে। যেটা আছে সেটাও আবার নেহাতই ছোটো। একবারে পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক ধরবে না। এই নৌকোতেই দু-তিনবার যাওয়া-আসা করতে হবে আর কি !

যাহোক, নৌকোয় কিছু-কিছু জিনিশ বোঝাই ক'রে তারা সেটাকে জলে

নাথালো। তারপর কী একটা কাজে ত্রিয়ঁ ও গরডনরা একবার ভিতরে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ছাখে, চমৎকার! ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স ততক্ষণে নৌকায় চড়ে বসে নৌকো ছাড়বার আয়োজন করছে! দেখেই ত্রিয়ঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! ডোনাগানের মতলব মোটেই সুবিধের নয়: একবার তারা ডাঙায় উঠতে পারলেই হয়, তারপর জাহাজের অন্যান্য ছেলেদের দিকে হয়তো ফিরেও তাকাবে না।

তীব্র স্বরে ত্রিয়ঁ বলে উঠলো, 'ও কী হচ্ছে, ডোনাগান? সবাই পড়ে রইলো, আর তোমরা দিকি আগে চলে যাচ্ছে!'

'আমাদের যা খুশি করবো,' উত্তর দিলে ডোনাগান, 'তুমি বারণ করবারকে?' 'বটে? দেখি, তোমরা কী ক'রে যাও!' বলেই ত্রিয়ঁ লাফিয়ে উঠলো নৌকায়।

এবার ওয়েব কথো উঠলো। শাটের আঙ্গিন গুটিয়ে বললে, 'ওটার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী বকছো? চলো ডোনাগান, আমরা বেরিয়ে পড়ি! ওহে ত্রিয়ঁ, তুমি চটপট স'রে যাও দেখি!' এই বলে ওয়েব সজোরে একটা ধাক্কা মারলে তাকে।

পড়তে-পড়তে সামলে নিলে ত্রিয়ঁ, নৌকো থেকে পাশের একটা পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লো সে। দলের মধ্যে তার গায়েই সবচেয়ে বেশি জোর। পাথরের উপর পা রেখে নৌকোর গলুই দু-হাতে কঠিনভাবে ধরে বললে, 'যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে!'

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে ওয়েব তৎক্ষণাৎ একটা দাঁড় তুলে নিয়ে ত্রিয়ঁর মাথায় মারবার উপক্রম করলে। ব্যাপার ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে দেখে গরডন চোখের নিমেষে নৌকায় লাফিয়ে প'ড়ে ওয়েবের দু-হাত চেপে ধরলো। এদিকে অন্যান্য ছেলেরাও ততক্ষণে ব'সে নেই: ডোনাগানদের স্বার্থপরতায় তারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। বাক্সটার, সারভিস, ইভারসন প্রভৃতির নৌকায় উঠে পড়ে যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে মারামারি করার আয়োজন করলে। গরডন তখন আর-কোনো উপায়ান্তর না-দেখে মরীয়া হ'য়ে গিয়ে এই যুযুধান ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে চ্যাচাতে শুরু করলো: 'কী হচ্ছে তোমাদের? এই কি তোমাদের ঝগড়া করবার সময়? এদিকে এই বিপদ, কোথায় তোমরা সবাই এক হ'য়ে পরস্পরের সাহায্য করবে, না এই সময় করছো মারামারি? লক্ষ্য করে না তোমাদের? সব যুক্তিসূচি একেবারে লোপ পেয়েছে?'

অবশেষে গরডনের ধমক খেয়ে তাদের কাণ্ডজ্ঞান হ'লো। শাস্ত হ'য়ে সকলে একে একে নৌকো থেকে নেমে পড়লো। ডোনাগানও দ্বিক্রান্তি না-করে নেমে এলো বটে, কিন্তু অন্য সকলের মতো তার মুখের ভাব আর স্বাভাবিক হ'লো না। গোমড়া মুখে সে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগলো।

ভাঁটার টানে জল তখন অনেকটা ক'মে গেছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের আশপাশে ঘূর্ণি দিয়ে ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্র। শেষকালে যৎকিঞ্চিৎ অল্পসঙ্কানের পর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেবার মতো একটা বেশ সংকীর্ণ প্রণালীও দেখা গেলো। কিন্তু সেখানটায় যে-রকম ঘূর্ণি আর স্রোত, তাতে নৌকো চালানো বিষম দুঃসাধ্য হবে। ভাঁটা শেষ হয়ে জল একেবারে শাস্ত স্থির হ'তে একেবারে বিকেল হ'য়ে যাবে।

গরডন বললে, 'এসো, ততক্ষণে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই।'

এ-কথায় অবিশ্বি কারুরই কোনো আপত্তি দেখা গেলো না। সবাই মিলে টিন ভেঙে বিস্কুট, জ্যাম আর শুকনো মাংস খেয়ে নিলে।

কিন্তু ভাঁটার টান যেন আর শেষ হয় না! স্রোত তেমনি বিষম র'য়ে গেলো। গরডন চিন্তিত হ'য়ে ত্রিয়াঁকে বললে, 'কী হবে এখন? ভাঁটা তো এখনো কমলো না!'

'হুঁ, তাই তো ভাবছি,' বললে ত্রিয়াঁ, 'আবার জোয়ার এসে পড়লে আমাদের আর কোনো আশা নেই।'

'ঠিক বলেছো,' গরডন তখনও কী করবে ভাবছে, 'জোয়ার আসবার আগেই আমাদের জাহাজ ছেড়ে নেমে যেতে হবে, কারণ এই নতুন জোয়ারে পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে।'

'সে তো বুঝি। কিন্তু এখন সবাই মিলে ডাঙায় পৌঁছোই কী ক'রে? ত্রিয়াঁ সব দেখে শুনে সত্যিই খানিকটা হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো। 'একটা ভেলা বানাবারও উপায় নেই। জাহাজের ভাঙা কাঠকুটো সব জলে ভেসে গেছে। আর তাছাড়া হাতেও আমাদের তেমন সময় নেই!'

'তাহ'লে উপায়?' জিগেস করলে গরডন।

'উপায় শুধু আমাদের এই নৌকোখানা,' ত্রিয়াঁ উত্তর দিলে। 'কিন্তু এতে তো আর সবাই পেরোতে পারবো না! তাই ভাবছি আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়! জাহাজের এই মোটা দড়িটা কেউ যদি একবার ওই প্রবালগুলির ওদিকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আসতে পারে, তাহ'লে কোমরে লাইফবেন্ট পরে এই দড়ি ধ'রে-ধ'রে আমরা সকলেই এইটুকু পথ পেরিয়ে যেতে পারি।

এখানকার ঢেউ যদিও অত্যন্ত ভয়ানক, তবু জল বোধকরি এক-গলার বেশি হবে না। দড়ি ধ'রে যেতে পারলে পাথরের উপর প'ড়ে মরবারও ভয় থাকবে না।'

'কিন্তু প্রবালগুলোর ওপাশে গিয়ে দড়িটাকে বেঁধে আসবে কে?' গরডন জিগেস করলো, 'যে যাবে সে তো আর নাও ফিরতে পারে! জলে যে-রকম ঘূর্ণি দেখছি, তাতে ডুবে মরারই সম্ভাবনা বেশি।'

অকম্পিত স্বরে ত্রিয়'ী বললে, 'আমি যাবো।'

'তুমি?' গরডন একেবারে অবাক। একটু খেমে তারপর সে বললে, 'ঠিক আছে। তাহ'লে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একাই যাবো।' গরডনের প্রস্তাবে কোনো কানই দিলে না ত্রিয়'ী, 'তুমি বরং জাহাজে থেকে বাকি সব দিক সামলাও।'

একবার যখন মনস্থির ক'রে ফেলা গেছে, তখন আর খামকা দেরি ক'রে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা মোটাশোটা শক্ত-গোছের দড়ি বেছে নিয়ে ত্রিয়'ী খুব আটো ক'রে নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর গরডনকে ডেকে বললো, 'গরডন, আমি এই দড়ি নিয়ে সমুদ্রে নামলুম। আমি যেমন সাঁতার কেটে এগুতে থাকবো, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছাড়বে। দেখো দড়ি ছাড়তে যেন দেরি কোরো না। কী রকম প্রবল ঘূর্ণি ও ডুবো পাথরের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে তা তো বুঝতেই পারছো!'

ছেলেরা সবাই ডেকের রেলিঙের ধারে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে ত্রিয়'ী। বড়ো বড়ো ঢেউ সেই নিরেট পাথরের উপর কাঁপিয়ে প'ড়ে চারদিকে ভয়ানক ঘূর্ণির সৃষ্টি করছিলো। সিন্ধুজলের সেই বিষম দাপট দেখে জাক তো ভয়েই অস্থির : কিছুতেই সে তার দাদাকে সমুদ্রে নামতে দেবে না—চোখ ছলছল ক'রে উঠছে, মুখ চোখ শুকনো ও আতঙ্কিত, শেষকালে হাপুস নয়নে কেঁদেই ফেললো। ভাইটিকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আর দোর না ক'রে চটপট সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো ত্রিয়'ী। তারপর ওই বিষম ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে কোনোরকমে এগুতে লাগলো তীরের দিকে। ছেলেরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। উদ্বেজনায় তাদের সমস্ত শরীর টান-টান হ'য়ে গিয়েছে—ত্রিয়'ীর দুঃসাহস দেখে কীরকম একটু সন্ত্রম লাগলো তাদের, মাঝে-মাঝে নিজেরাই সজোরে রেলিঙ চেপে ধ'রে নিজের সামলাতে লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেলো, সামনে একটা প্রবল ঘূর্ণি। এই বুঝি পাক খেতে-খেতে জল তাকে ডুবিয়ে ফ্যালে! ত্রিয়'ী প্রাণপণে সেটা পেরোবার জন্তু লড়াই করছে,

কিন্তু পারছে না। চক্ষের পলকে ত্রিয়ার সেই ঘূর্ণির মধ্যে ডুবে গেলো। শুধু শোনা গেলো একটা ক্ষীণ আর্তনাদ : 'গরডন !'

গরডন তৈরিই ছিলো। প্রাণপণে সে দড়ি ধ'রে টান দিলে—অন্য ছেলেরাও এসে তাকে সাহায্য করলে, তারাও গায়ের জোরে দড়ি ধ'রে টান দিতে লাগলো। ভাগ্যিণী দড়ি বাঁধা ছিলো কোমরে : কোনোরকমে হতচেতন ত্রিয়ারকে জাহাজে টেনে তোলা হ'লো। আর এই পুরো ব্যাপারটা যখন ঘটছে, তখন জাক সজোরে রেলিও চেপে ধ'রে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু এখন উপায় কী হবে তাদের ? দড়ি তো বাঁধা হ'লো না, এখন কেমন ক'রে তারা ডাঙায় গিয়ে উঠবে ? দেখতে-দেখতে বেলা প'ড়ে এলো, আর তাঁটা শেষ হ'য়ে ফের জোয়ার এসে পড়লো। ছেলেরা ডেকের উপর জড়ো হয়ে হতাশ, শূন্য চোখে নির্বাক হ'য়ে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখতে লাগলো। কেমন ক'রে ঢেউ আরো বেড়ে উঠলো, জল ফুলে উঠলো, আর ফেনিল ধাবমান জলরাশি প্রবাল-প্রাচীর ঢেকে দিলো, সব দেখতে দেখতে তাদের সব আশা ভরসা ধীরে-ধীরে নিমূল হ'য়ে গেলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই জোয়ারের টানে জাহাজ ফের জলে ভেসে উঠে ঢেউয়ের উপর ছলতে-ছলতে চারদিকের পাথরের গায়ে ঠোকা-ঠুকি করতে লাগলো আর তারা ক্লান্ত বিমর্ষ ও চূপচাপ ভাবে ডাঙার এত কাছে এসেও কেমন ক'রে ডাঙায় পৌঁছনো গেলো না তাই ভেবে-ভেবে আরো হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ সবাই ভীষণ চীৎকার ক'রে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। সামনেই পাহাড়ের সমান উঁচু এক মস্ত ঢেউ ! বোনো আঁতকায় জঙ্কর মতো বিকট গর্জন করতে-করতে ঢেউটা একেবারে তাদের মাথার উপর এসে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ প্রায় কুড়ি ফুট উপরে লাফিয়ে উঠলো এবং...

এবং মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ সেই সিকি মাইল জোড়া শিলাস্তুত প্রবালশ্রেণী পেরিয়ে একেবারে উপলবঙ্গুর বালুময় উপকূলে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

ঢেউ স'রে যেতেই দেখা গেলো জাহাজ শুকনো বেলাভূমিতে কাত হ'য়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেরা কেউ তেমন আহত হয়নি।

সামনেই সেই স্তূরবিস্তৃত হলভূমি।

গোড়ার কথা

আমাদের এই কাহিনী বখনকার, চারম্যান বোর্ডিং ইশকুল তখন নিউজীল্যান্ডের অকল্যাণ্ড শহরের বড়ো ইশকুলগুলোর অন্যতম। উপনিবেশের প্রায় সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই এই ইশকুলে পড়তো। ইয়োরোপের যে-কোনো সেরা পাবলিক ইশকুলের সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। শুধু যে লেখাপড়ার মানই উঁচু ছিলো তা-নয়, পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত নানা বিষয়েও ছাত্রদের এমনভাবে উৎসাহ দেয়া হতো যে এখান থেকে পাশ ক'রে বেরুবার পর ছাত্ররা প্রায় সব অর্থেই মানুষ হয়ে যেতো।

ওলন্দাজ নাবিকেরা যখন প্রথম নিউজীল্যান্ড দ্বীপে পদার্পণ করে, তখন তারাই এই সুন্দর নামটি দেয়, যার অর্থ হ'লো 'নব সিন্ধু-সৈকত'। নিউজীল্যান্ডের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অমন সুন্দর-সুন্দর বরফ-মোড়া সারি-সারি পাহাড়, মায়ালোকের মতো অমন অপূর্ব সব হ্রদ, অতীত হিম-যুগের সব বরফের নদী ও হিমবাহ, অমন উষ্ণ জলের প্রস্রবণ পৃথিবীর কটা দেশেই বা আছে? দেশের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আবার দুর্গম অরণ্য, তার মূল দ্বীপের চারদিকে আরো কত ছোটো-ছোটো সোনালি দ্বীপ।

১৮৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি একদল ছেলে আর তাদের আত্মীয়স্বজনরা হই-চই করতে-করতে ইশকুল থেকে বেরিয়ে পড়লো। ছুটি শুরু হ'লো কিনা : ছেলেদের হাতে এখন দু-মাসের স্বাধীনতা, আস্ত দুটি মাস জুড়ে অথও অবসর। কোনো-কোনো ছেলের আবার এই ছুটিতে সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা। কত মাস ধ'রে ক্লাসের মধ্যে পড়াশুনোর কঁাকে-কঁাকে এই সমুদ্র-পাড়ির প্রত্যাশায় উদাস হ'য়ে গিয়েছে তাদের চোখ, কতদিন তারা এরই প্রতীক্ষায় তন্ময় হ'য়ে রয়েছে ইশকুলে। অন্য ছেলেদের ঈর্ষার কারণ হ'য়ে উঠেছিলো : আহা, এই ছুটিতে ওরা নিউজীল্যান্ড দ্বীপের চারধারে একটা ছোটো জাহাজে ক'রে ঘুরে দেখবে। ছেলেদের অভিভাবকেরা দেড় মাসের জন্তু একটা স্কুনার ভাড়া করেছেন। স্কুনারটা ইশকুলেরই একটি ছেলের বাবার—ক্যাপটেন উইলিয়াম গারনেটের।

এই ভাগ্যবান ছেলেদের মধ্যে যেমন ইশকুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছেলে ছিলো, তেমনি ছিলো একেবারে নিচু ক্লাসের ছেলেও। বয়েস তাদের আট থেকে চোদ্দর মধ্যে। ব্রিয়ান আর জাক দুই ভাই, তারা আসলে ফরাশি, আর গরডন মার্কিনি, এছাড়া আর সবাই ইংরেজ।

যে-জাহাজে ক'রে ছেলেরা ঘুরে বেড়াবে ব'লে ঠিক হয়েছিলো, সেটি একটি পালতোলা 'স্কনার'-জাতীয় জাহাজ। একদা অবিগ্নি এই জাহাজ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর তাসমানিয়া দ্বীপের চারদিকে অনেক টহল দিয়েছে, এমনকি টরেন্স প্রণালী পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সেকলে ধরনের হ'লেও জাহাজটি কিন্তু খুব মজবুত। জাহাজের জন্মে একজন কাপ্তেন, দু-জন মেট, ছ-জন নাবিক আর একজন বাবুঁচি ঠিক করা হয়েছিলো। আর ফাইফরমাস টুকিটাকি কাজ দারবার জন্ম নিয়োগ করা হয়েছিলো আমাদের পূর্বপরিচিত বালক ভূতা মাওরি মোকোকে।

সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে যাত্রার দিন ঠিক হ'লো ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ। সেদিন সকালবেলায় অকল্যাণ্ড থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাই আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় জাহাজের কাপ্তেন, মেট আর নাবিকেরা বিশ্বস্ত মোকোর হাতে জাহাজের ভার রেখে শহরে গিয়েছিলো একটু আমোদপ্রমোদ ও ফুঁতি করতে। পরদিন ভোরবেলায় ফিরে এসে তারা জাহাজ ছাড়বে। এদিকে অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে ও কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে চোদ্দটি ছেলে আগের দিন বিকেলবেলাতেই জাহাজে এসে চড়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো, তাদের অভিভাবকেরা পরদিন ভোরবেলায় এসে অভিযানে যোগ দেবেন।

সঙ্গে কোনো বয়স্ক অভিভাবকও নেই, কাপ্তেনও নেই, তাই ছেলেরা প্রাণভ'রে জাহাজের উপর হই-হল্লা শুরু ক'রে দিলে। মোকো জাহাজের লোক হ'লে কী হবে, তারও তো বয়েস খুব-একটা বেশি নয়, মাত্র চোদ্দ বছর, তাই সেও তাদের ছল্লোড়ে ও শোরগোলে যোগ দিতে ছাড়লে না। তাছাড়া জাহাজটা তো একটা বয়ার সঙ্গে খুব মজবুত ক'রে বাঁধা আছে, কাজেই ভয়ের আর কী?

রাত দশটা অবধি ছেলেরা জাহাজের উপর নৃত্য, হট্টগোল, লম্ফঝম্প ও চীৎকার ক'রে অবশেষে নেহাতই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সেলুনের আলো নিভিয়ে যে-যার বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, আর ক্লান্তি ও উত্তেজনার দরুন যেমনি শোয়া অমনি ঘুম। মোকো কেবল একবার বাইরে এসে চারদিক ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিশ্চিত হ'য়ে শুতে গেলো। যদিও বেশ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিলো, তবু আশঙ্কার কিছুই ছিলো না।

তারপরে যে কী হয়েছিলো, তা আর কেউ জানে না। কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে যায়, আর বাতাসের টানে জাহাজ বন্দরের বাইরে এসে পড়ে। গভীর অন্ধকার রাত্রি, তার উপর তীব্র ঝোড়ো হাওয়া,

এদিকে জোয়ারও তখন হু-হু করে কমে যাচ্ছে : এমন সব অনুকূল অবস্থার আবেষ্টনে পড়ে যে জাহাজ সারারাত সমুদ্রে ভেসে চললো, তা তার ঘুমন্ত আরোহীরা জানতেও পারেনি।

প্রথমে ঘুম ভেঙেছিলো মোকোর। ব্যাপার দেখে তার তো চোখ প্রায় রূপালে ওঠে আর কি ! জাহাজ যে কোথায়, কতদূরে এসে পড়েছে, তা সে কিছুই হৃদিশ করে উঠতে পারলে না। কিছুক্ষণ ভাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে সে ছেলেদের ডেকে তুললে। কিন্তু তারাই বা কী করে ? সেই অন্ধকার রাতে ঝড়-ওঠা মাঝ-দরিয়ায় কে কোথায় আছে যে সাহায্য করবে ? তখন তারা নিউজীল্যান্ড থেকে অনেক মাইল দূরে চলে এসেছে। হতভম্ব যাত্রীদের নিয়ে জাহাজ সোজা পূবদিকে ভেসে চললো অভিশপ্তের মতো।

আকাশে বেশ গাঢ় মেঘ জমে উঠেছে ততক্ষণে ; ঝোড়ো হাওয়া পরিণত হয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে, চারদিকে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। দিনের বেলাতেও চারদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো : ঘন মেঘের আবরণে আকাশের মুখও ঢাকা পড়ে গেছে।

বিপদের সময়েই মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, সময়ই উদ্ঘাটিত করে মুহূর্তের মানুষের পরিচয়। সবাই যখন ভীত ও হতভম্ব, তখন ত্রিয়্যাই চটপট কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলো। মুহূর্তেই বসে না-থেকে সে মোকোর সাহায্যে মাঙ্গলে পাল টাঙিয়ে জাহাজের গতি ঠিক করে রাখার চেষ্টা করলে। ত্রিয়্য। বুদ্ধি করে এ-সব না-করলে জাহাজটা হয়তো ওই ঝড়ের পাল্লায় পড়ে একেবারে ডুবে যেতো।

কেবল যে হাল ধরে, পাল টাঙিয়ে, জাহাজ চালনার ব্যবস্থা করেই ত্রিয়্য। ক্ষান্ত হ'লো তা নয়, কাগজে সমস্ত বিবরণ লিখে অনেকগুলো বোতলের মধ্যে ভরে ভালো করে ছিপি এঁটে জলে ভাসিয়ে দিলে। যদি একটা বোতল কার হাতে গিয়ে পড়ে, যদি সেই খবর পেয়ে কোনো জাহাজ তাদের হৃদিশ পায় ও উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসে ! কিন্তু সেই অথই অপার মহাসমুদ্রের মধ্যে ওইটুকু ছোটো বোতল আর কারই বা চোখে পড়বে !

এই ঝড়ের মধ্যেই এ-রকমভাবে সীমাহীন মহাসমুদ্রে তাদের দিন-রাত্রি কেটে গেলো।

ওদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় যখন জানা গেলো যে জাহাজখানা যেন কেমন করে অকল্যাণ ছেড়ে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়েছে, এবং জাহাজে

একজনও অভিজ্ঞ নাবিক বা বয়স্ক মানুষ নেই, তখন সেখানকার সকলের মনের অবস্থা কী রকম হ'য়ে উঠলো, তা বেশ সহজেই অনুমান করা যায়।

তক্ষুনি বেতारे চারিদিকে খবর পাঠানো হ'লো, কত জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের সন্ধানে সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়ালো, কিন্তু সব চেষ্টাই মিথ্যে হ'লো যখন একের পর এক দিন কেটে গেলেও কেউই সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কোনো খবর আনতে পারলে না। ছেলেদের অভিভাবকদের এটা বুঝতে আর বাকি রইলো না যে সমুদ্র নিশ্চয়ই এতদিনে তাদের গ্রাস ক'রে নিয়েছে।

দিনের পর দিন কেটে গেলো, তবুও কোনো দিক থেকে তাদের কোনো খবর এলো না। শেষকালে সকলেই তাদের আশা ছেড়ে দিলে। দু-মাস পরে যখন চারম্যান বোর্ডিং স্কুল আবার খুললো তখন সেই চোদ্দটি ছেলে আর ক্রাস-ঘরে ফিরে গেলো না।

ডাঙায়

ধু-ধু করে বালুরাশি।

ঝাঁকুনি সামলে উঠেই ছেলেরা ছড়মুড় করে সেই স্বদূরবিস্তৃত বেলাভূমির উপর নেমে পড়লো। মাটিতে পা দিয়েই ছোটোরা তো প্রথমে ধেই-ধেই ক'রে উঠলো, এতো দিন জল দেখে-দেখে তারা রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। একটু যারা বড়ো কেবল তারাই মাটির উপর নেমে চারদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

কোনো দিকেই জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই—এমনকি জঙলিদের কুঁড়েঘর পর্যন্ত দেখা গেলো না কোথাও। পাহাড়ের তলায় কিংবা গাছের নিচে—কেউ যে কোনোদিন এ-সব জায়গায় ছিলো, তা পর্যন্ত মনে হ'লো না। অনতিদূরেই দেখা গেলো একটি নদীর মোহানা, জোয়ারের জলে টইটুশুর ও আবর্তমান। কিন্তু সেখানেও না-আছে কোনো নৌকো, না বা কোনো ছোটো ডিঙি। এমনকি বেলাভূমির সোনালি বালির উপর কারু কোনো পায়ের ছাপ পর্যন্ত দেখা গেলো না। দূরে-কাছে কোথাও ধোঁয়ার চিহ্নটুকুও নেই—অস্ত্রত বা দেখে বোঝা যেতো যে এখানে না হ'লে দূরে কোনোখানে নিশ্চয়ই মনুষ্যবসতি রয়েছে।

এই অবস্থায় তাদের কর্তব্য কী, ত্রিয়ঁ আর গরডন প্রথমে তাই নিরূপণ করার চেষ্টা করলে। পরামর্শ করে সব স্থির ক'রে নেয়া উচিত। গরডনকে গম্ভীর ও চিন্তাশীল দেখে ত্রিয়ঁ কিঞ্চিৎ ভরসা দেবার চেষ্টা করলে, 'না-হয় এ-অঞ্চল জনহীন, কিন্তু তাতে হয়েছে কী? এখানে আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ রয়েছে—আছে প্রচুর খাদ্য ও গুলিবাক্স। অতএব আপাতত এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাবনা নেই। বরং এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মাথা গৌজবার মতন একটা আশ্রয় ঠিক করা। তারপর ধীরেস্থির সরেজমিন তদন্ত ক'রে না-হয় দেখা যাবে আমরা পৃথিবীর কোন জায়গায় এসে উঠেছি। যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তাহ'লে এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি এটা সত্যি-সত্যি একটা দ্বীপই হয় এবং এখানে যদি কোনো মনুষ্যবসতি না-থাকে, তাহ'লে তা নিয়ে আপাতত ভাবিত হওয়ার কিছু দেখছি না। উপযুক্ত এতগুলো বিপদের হাত থেকে যখন রেহাই পেয়েছি, তখন এত শিগগির আমরা মরবো না নিশ্চয়ই—এ তো আর ভীষণ সমুদ্র নয়, ডাঙা, পায়ের তলায় অস্তুত শক্ত মাটি আছে। একটু উদ্ধারের পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

সবাই মিলে আলোচনা ক'রে প্রথমে স্থির করা হ'লো—যতদিন না দ্বীপের উপর একটা কোনো ভালো আশ্রয় মিলছে, ততদিন তারা জাহাজেই থাকবে। জাহাজটা যদিও অল্প কাত হ'য়ে পড়েছে, তবু তাতে অসুবিধের কিছু নেই। ডেকের সামনের দিকটা উড়ে গেছে বটে, কিন্তু সেলুনের ভিতরটা তখনও রীতিমতো মজবুত ছিলো। জাহাজের মালপত্রেরও আর কষ্ট ক'রে দ্বীপে ব'য়ে আনতে হবে না এখন। জাহাজে জ্বিনিশ তো আর নেহাত কম ছিলো না! এতজন লোকের প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে যা-কিছু দরকার হ'তে পারে, সবই তাতে মজুত করা ছিলো। খাদ্য ছিলো যথেষ্ট পরিমাণ ও নানা ধরনের—টিনে-ভরা নোনা মাংস, বিস্কুট, কিছু ফলমূল, আরো কত কী। তাছাড়া জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, বাসনকোশন, অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, বাক্স, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র প্রভৃতি কোনো জিনিসেরই অভাব নেই। শক্ত মাটিতে ঠোকর খেয়ে জাহাজটার এখন ষে-দশা হয়েছে, তাতে তাকে আর সমুদ্রে ভাসানো যাবে না সত্যি, কিন্তু এখনও অনেকদিন এটা বাসের উপযোগী থাকবে। উঠতে-নামতে যাতে কোনো কষ্ট না-হয়, সেইজন্ম একটা দড়ির মই তারা ব্যবহার করলো। মোকোর উপর দেয়া হ'লো রান্নাবান্নার ভার। আর চীফ-বার্টি মোকোকে সাহায্য করার জন্যে নিজেকে থেকেই এগিয়ে এলো বাক্সটার, বললে ষে রান্নার

ব্যাপারে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। বাড়িতে সে দিদির কাছে হরেক রকম সৌখিন ও সুখাচ্ছ তৈরি করতে শিখেছিলো।

এইসব আলোচনার মধ্যে আশ্বে-আশ্বে সকলেরই মনের ভার হাঙ্কা হ'য়ে যাচ্ছিলো। আগের মতো ভয় আর উত্তেজনার সেই টান-টান ভাবটা আর ছিলো না, বরং সকলেই বেশ হাসিমুখি ও উল্লসিত। কে জানতো যে তারাই 'স্বাইস ফ্যামিলি রবিনসন' বা 'রবিনসন ক্রুসো'র মতো একটা দ্বীপে গিয়ে এমনভাবে দিন কাটাতে? কিন্তু এদের মধ্যে কেবল একজনের মুখেই কোনো হাসির রেখা ফুটলো না, সে ব্রিয়ঁর ছোটো ভাই, জাক।

আশ্বে-আশ্বে রাত ক'রে এলো। আজ কতদিন তারা নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারেনি। আজ বেশ তাজা ও হালকা লাগছে, চটপট খেয়ে নিয়ে তারা ঘে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে ঘুমোতে যেতে সাহস করলে না। ছোটোরা শুতে গেলে পর ব্রিয়ঁ, গরডন আর ডোনাগান পালা ক'রে রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলো। কে জানে অজানা জায়গায় কখন কী বিপদ আসে!

রাতটা কিন্তু নির্বিঘ্নেই কেটে গেলো। ভোরের আলো দেখা দিতেই ঘুম ভেঙে গেলো সকলের। আর সকাল হ'তেই ওদের কাজকর্ম শুরু হ'য়ে গেলো : এখন ওদের কাজের আর অস্ত নেই। প্রথমে জাহাজের সব জিনিশের একটা তালিকা তৈরি ক'রে নেয়া উচিত—কী-কী আছে না আছে, তা জানা থাকা ভালো। কত জিনিশ রয়েছে জাহাজে, কত বিচিত্র যন্ত্রপাতি। আশা করা যায় সহজে কোনো কিছুর জন্মেই তাদের কষ্টে পড়তে হবে না। অভাব হবে শেষ পর্যন্ত শুধু খাওয়ার। ভাঁড়ারে মতই জমা থাক, তাতে নিশ্চয়ই খুব বেশি দিন চলবে না—অথচ এখানে যে কতদিন তাদের কাটাতে হবে কে জানে!

খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই গরডন একবার জাহাজের খাবার-দাবারের পুঁজি দেখে বললে, 'এ-সব খাবারে এখন আমাদের হাত দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং পাহাড়ের ফাটলে একবার পাখির ডিমের সন্ধান ক'রে দেখলে মন্দ হয় না। এ-খাবার যতক্ষণ পারা যায় স্পর্শ না-করাই উচিত আমাদের—কখন কোন কাজে লাগবে কে জানে।'

গরডনের কথা শুনে ইভারসন একেবারে নৃত্য ক'রে উঠলো। 'ঠিক কথা! চলো, এছুনি পাহাড়ে গিয়ে পাখির ডিম যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।'

সারভিস আবার আরো গেলো। সে বললে, 'নদীতে ছিপ ফেলে ব'সে

যাই বরং—কী বলো ! জাহাজে তিন-চারটে ছিপ আছে, আমি দেখেছি । তোমাদের মধ্যে কে-কে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে বলো ।’

সারভিসের কথায় ডোল, কোস্টার প্রভৃতি কয়েকজন চেষ্টা করে উঠলো, ‘আমি যাবো, আমি যাবো !’

কিন্তু ত্রিয়ার সবাইকে খামিয়ে দিয়ে বললে, ‘এখন অমন খেলা করতে গেলে চলবে না । যারা সত্যি-সত্যি মাছ ধরতে পারবে, তারাই শুধু মাছ ধরতে যাবে । আপাতত বরং সমুদ্রতীর থেকেই কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে আনা যাক । এই ঝীপে ঝিনুকই আমাদের প্রথম খাদ্য হোক—ঝিনুক কুড়োতে হ্যান্ডায়াও নেই বিশেষ, খেতেও খুব মুখরোচক ।’

এ-কথা শুনে ছোটোরা হই-হই করে সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়োতে ছুটলো ।

ইতিমধ্যে বড়োরা বসে-বসে জাহাজের জিনিশপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেললো । দরকার হ’লে যাতে চটপট খুঁজে পাওয়া যায়, সেইজন্য জিনিশগুলো কোথায়-কোথায় আছে, তাও পাশে লিখে রাখতে ভুললো না । ব্যারোমিটার, কম্পাস, স্টার্মগ্লাস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছাড়া জাহাজে ছোটো-বড় পাল ছিল অনেকগুলি । তাছাড়া রশি ও দড়িরও কোনো অভাব ছিলো না । আর ছিলো লোহার কাঁটা-তার, নদীতে মাছ ধরার জন্যে তিনটে ছিপ, আর সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরবার জন্যে সৰু তার । আগ্নেয় অস্ত্রের মধ্যে ছিলো আর্টটা পাখি-মারা বন্দুক, বুনো জানোয়ার শিকার করার জন্যে একটা রাইফেল, তাছাড়া ছিলো বারোটা রিভলভার । টোটা ছিলো তিনশোরও বেশি, বারুদ ছিলো দুই পিপে ; আর শিশের গুলি ছিলো অসংখ্য । এছাড়া রাতের অন্ধকারে বা কুয়াশায় নিশানা দেবার জন্যে হাউইও ছিলো কতকগুলো ।

আরো দুটি জিনিশ ছিলো—দুটো সুন্দর পেতলের কামান আর তাদের উপযোগী গোলা । ঝড়ের মধ্যে বা রাতের বেলায় সংকেত জানাবার জন্যে ব্যবহার করা হ’তো কামানদুটি—কিন্তু এখন অবিশিষ্ট সে-সবের আর প্রয়োজনীয়তা নেই । যদি এটা কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ হয়, আর যদি এখানে জঁলিদেরই বাস থাকে, তাহ’লে ভবিষ্যতে জঁলিদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় হয়তো কামানদুটি কাজে লাগবে ।

দুপুরবেলায় সারভিস, ডোল আর কোস্টার প্রচুর ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরে এলো । এসেই উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে তড়তড় করে যা বললো, তার সারমর্ম হ’লো এই যে, ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে তারা অনেক বুনো পায়রা দেখে

এসেছে। তাদের কথা শুনে ত্রিয়ঁা বললে, 'বেশ ? একদিন গিয়ে দেখে আসা যাবে। এইসব পাহাড়ি কবুতরের ডিম খেতে মন্দ হবে না।'

ডোনাগান বললে, 'আর দু-চারটে কবুতর গুলি ক'রে মারলেই হবে।'

'কিন্তু,' বললে গরডন, 'তাদের বাসা থেকে ডিম আনা কী কষ্টকর হবে, সেটা কেউ ভেবে দেখেছো ? পাহাড়ে উঠে ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাই ধ'রে নেমে পাহাড়ের ফাটল থেকে ডিম আনতে হবে। এইসব পাখি থাকে পাহাড়ের মাঝামাঝি।'

'তা আমি জানি,' বললে ডোনাগান, 'তবু গোটা-কয়েক পাখি শিকার ক'রে আনলেই হয়। ক্রস, ওয়েব, আর উইলকক্স—তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে ?'

ওরা যাবার উদ্যোগ করতেই ত্রিয়ঁা বললে, 'ডোনাগান, বেশি গুলি নষ্ট কোরো না যেন। গোটা চারেক পাখি মারলেই হবে।'

এমন সময় মোকো এসে সংবাদ দিলে, 'রান্না তৈরি। তোমরা সবাই খাবে এসো।'

অগত্যা তখন পাখি মারার প্রস্তাব স্থগিত রেখে সবাই মিলে খেতে চললো। খেতে ব'সে সকলের কী খুশি, যেন পিকনিকে এসেছে। জাহাজের ডেকের উপর সার বেঁধে ব'সে নানা কথা বলতে-বলতে সবাই মিলে হল্পা করে খাওয়া শুরু করলো।

জাহাজের জিনিসপত্রর ঠিক ক'রে রাখতে-রাখতেই বিকেলটা কেটে গেলো। সারভিস, ইভারসন, ডোল আর কোস্টার ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলো। সন্ধ্যার আগেই তিনটে বড়ো-বড়ো মাছ নিয়ে জাহাজে ফিরলো ওরা। রান্ধিরে সবাই পেট ভরে সেই তাজা মাছভাজা খেয়ে বিছানায় শুতে গেলো। ওয়েব আর উইলকক্স দু'জনে পালা ক'রে সারারাত পাহারা দিলে—যদিও এ-যাবৎ ডাঙায় কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তবু কখন কী হয় বলা তো যায় না।

মনুষ্যকাল

গরডন, ত্রিয়ঁ আর ডোনাগানের মনে এখন দিনরাত কেবল একটাই প্রশ্ন : এটা কি কোনো দ্বীপ, না মহাদেশ ?

বুদ্ধিতে ও বয়েসে এই তিনজনই দলের মধ্যে ষা একটু বড়ো। তাই এই তিনজনই কেবল ভবিষ্যতের ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে থাকতো। গাছপালার চেহারা আর আবহাওয়ার রকমশকম দেখে তারা এটা বুঝেছিল যে দ্বীপই হোক আর মহাদেশই হোক—জায়গাটা যে আদৌ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত নয়, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকা উচিত নয়। সম্ভবত জায়গাটা নিউজিল্যান্ডের চেয়ে আরো নিচে দক্ষিণ মেরুর কাছে কোথাও অবস্থিত।

শেষকালে ত্রিয়ঁ একদিন পরামর্শ দিলে, 'চলো, একদিন আমরা তিনজনে পাহাড়ের উত্তর দিকটা ঘুরে আসি। ওদিকে একটা অস্তরীপের মতো আছে—জাহাজ থেকে আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। তখন মনে হয়েছিলো অস্তরীপের পাহাড়টা অস্তুত তিনশো ফুট উঁচু হবে।'

কিন্তু বৃষ্টি আর কুয়াশার উৎপাতে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের আর এই পরিকল্পনা কাজে খাটানো হ'য়ে উঠলো না—বেশ কিছুদিন আর জাহাজ থেকে বেরুতে পারলে না তারা। অভিযানে না-বেরুলেও অবশ্য এদিকে তাদের এটা-ওটা কাজের অস্তু ছিলো না। এরই মধ্যে অবিশি কঁাক পেলেই বা মেঘ স'রে গেলেই ডোনাগান তার তিন শাগরেদকে নিয়ে দু-বেলা বন্দুক নিয়ে বুনো পাখি মারতে যেতো। দ্বীপের উপর প্রচুর বুনো পায়রা থাকে—খেতেও বেশ স্তম্ভ।

একদিন মাছ ধরতে গিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। ছেলেরা সেদিন মোহানার কাছে মাছ ধরতে গিয়েছিলো। সারা সকাল আর দুপুর ধ'রে একটানা বৃষ্টি হবার পরে বিকেলের দিকে আকাশ তখন দিগ্বি পরিষ্কার। ডোনাগানের দল গেছে পায়রা শিকারে। জাহাজের কাজে ব্যস্ত শুধু ত্রিয়ঁ, গরডন, বাস্টার আর মোকো।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে ছেলেদের শোরগোল ভেসে এলো। হঠাৎ অমন চ্যাচামেচি শুনে ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ত্রিয়ঁরা নদীর দিকে ছুটে গেলো। ওদের দেখেই জেনকিন্স চীৎকার ক'রে উঠলো, শিগগির দেখবে

এসো, ইভারসন কেমন ঘোড়ায় চড়েছে ! শিগগির ছুটে এসো, নইলে ঘোড়া
এখনি জলে পালাবে—সমুদ্রের ঘোড়া কিনা !’

কাছে এসে ত্রিয়ঁরা ছাথে, কোস্টার আর ইভারসন কী-একটা জানোয়ারের
পিঠের উপর চেপে বসেছে, আর জানোয়ারটাও ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে
যাবার জগে আকুলিবিকুলি করছে। আরো কাছে এসেই ব্যাপারটা তাদের
কাছে স্পষ্ট হ’লো। জানোয়ারটা আর কিছুই নয়—একটা অতিকায় সমুদ্রের
কাছিম। ইভারসন আর কোস্টার তার পিঠে বসে শক্ত ক’রে তাকে আঁকড়ে
আছে, আর অন্য ছেলেরা একটা মস্ত দড়ি কাছিমটার মুখের দু-পাশ দিয়ে
লাগামের মতো ক’রে ওটাকে টেনে রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কার সাধি
ওটাকে থামায় ! সেই অতিকায় কাছিম অনায়াসে ছেলেদের টেনে নিয়ে
চললো।

ত্রিয়ঁর মনে হ’লো এই কাছিমটাকে পাকড়াও করলে মন্দ হয় না—অস্তুত
কয়েকদিনের জগু আর-কোনো খাওয়ার ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এই অতিকায়
সমুদ্রের ঘোড়াকে কী ক’রে ধরা যায় ? গুলি ক’রে মারবার চেষ্টা করলেও
তার কিছু হবে না। পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট তার খোলা।

‘কী করে কাছিমটাকে আটকানো যায়, গরডন ?’ ত্রিয়ঁ জিগেস করলো।

গরডনের মাথায় কিন্তু ততক্ষণে একটা মতলব গেলে গেছে। সে বললে,
‘ওটাকে ধরবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওটাকে উন্টে চিত ক’রে ফেলা।’

‘কিন্তু অত বড়ো দশামই আর ভারি জন্তুকে উন্টে ফেলবেই বা কী ক’রে ?’
জিগেস করলো সারভিস, ‘ওজনে এটা হয়তো দশ মণ হবে—যা বিরাট দেখতে !’

‘উন্টে ফেলা হয়তো যাবে,’ বললে ত্রিয়ঁ। ‘শিগগির কতগুলো বাঁশ নিয়ে
এসো। যাও, দেরি কোরো না।’

মোকো আর সারভিস জাহাজ থেকে বাঁশ আনতে ছুটলো। সমুদ্র তখন
মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে। ত্রিয়ঁ আর দেরি না ক’রে চটপট ছুটে গিয়ে
ইভারসন আর কোস্টারকে নামিয়ে নিলে—তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে
দড়ি ধ’রে টান লাগালে। অতগুলো ছেলে মিলে টান দিচ্ছে, তবু সেই
কচ্ছপমশাই নিবিকারচিত্তে অবলালাক্রমে একটু একটু ক’রে এগুতে লাগলো—
এই অদ্ভুত টাগ-অভ-ওয়ারে তার যে আদৌ হারবার সম্ভাবনা আছে, তা
মোটাই মনে হ’লো না, বরং সবাইকে টেনে নিয়ে সে চললো। আর বুঝি
রাখা যায় না, কচ্ছপটা বুঝি জিতেই গেলো ! এমন সময় মোকো আর সারভিস
হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁশ নিয়ে এসে হাজির। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষকালে

অনেক কষ্টে তাকে চিত করা গেলো, আর চিত ক'রে ফেলতেই তার সব প্রতিরোধের অবসান হ'লো। চিতপাত কচ্ছপটা তার বেচারিমতো মুখ বার ক'রে চার পা শূণ্যে তুলে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

মোকো বললে, 'এই কচ্ছপের মাংস ভারি মিষ্টি আর নরম। চলো, আজ তোমাদের রেঁধে খাওয়াবো।'

হাতে কুড়ুল ছিলো, কাজেই কচ্ছপ-শিকারে আরকোনো অস্ত্রবিধে হ'লো না।

ওরা ঠিক করলে, সবটুকু মাংসই নিয়ে যাবে। হুন মাথিয়ে রেখে দিলে ভবিষ্যতে খাবারের অভাব হবে না। কিন্তু অত বড়ো কচ্ছপটা তো আর আশু ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সবাই মিলে হই-হই করতে-করতে জাহাজে ফিরে এলো। সারভিস অবিশ্বি বেশি অতিরঞ্জন করেছিলো—দশ মণ নয়, মণ চারেক হবে হয়তো কচ্ছপটা। কিন্তু তাই বা নেহাত কম কা ?

দেখতে-দেখতে এপ্রিল মাস এসে গেলো।

ঝড়বাদলও অনেকটা কমে এসেছে ইতিমধ্যে, আগের মতো আর একটানা দিবারাত্রি বর্ষণ নেই। ব্যারোমিটারের পারদও অনেকটা উঠেছে। আশা করা যায় এখন আর কিছুদিন তেমন প্রবলভাবে ঝড়বৃষ্টি হবে না। আর এটাই সুযোগ : এরই মধ্যে যেমন করেই হোক শীত আসবার আগে মাথা গাঁজবার মতো একটা আশ্রয় তাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

সেদিন ডোনাগান বললে, 'চলো ত্রিয়ঁ, কাল আমরা কজনে গিয়ে পূব-দিকটা নিরীক্ষণ ক'রে আসি। বনের মধ্য দিয়ে বেশ শটকাট ক'রে যাওয়া খাবে, অতটা ঘুরতে হবে না।'

ত্রিয়ঁ ঝাড় নাড়লে, 'বেশ, চলো।'

গরডন তাদের পরিকল্পনা শুনে বললে, 'তোমরা যদি কাল সকালে যাত্রা করো, তাহ'লে নিশ্চয়ই কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবে ?'

'তা না-ফিরতেও পারি,' জানালে ত্রিয়ঁ, 'কোনো কারণে যদি দু-দিন দেরিও হয়, তাহ'লে তোমরা যেন খামকা ভেবে মোরো না।'

সঙ্গে দিন-চারেকের উপযোগী খাবার নিয়ে ত্রিয়ঁ, ডোনাগান, সারভিস আর উইলকক্স পরদিন হুর্ষোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিলে। চারটে রিভলভার, কিছু গুলিগোলা, দুটি কুড়ুল—এইসব নিয়ে তারা রীতিমতো

সশস্ত্র হয়েই অভিযানে বেরোলো। সঙ্গে আরো নিলে একটা ~~কম্পাস~~ একটা শক্তিশালী ছুরবিন। উপরন্তু সঙ্গে চললো কুকুর ফ্যান।

সেদিন আকাশ ছিলো স্বচ্ছ, নীল; হালকা শাদা মেঘ ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে মন্দমধুর বাতাসে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই চতুরঙ্গ বাহিনী সমুদ্র-তীরের পাথরগুলো পেরিয়ে সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মস্ত সব গাছের ডালপালা মাথার উপরে: কত রকমের পাখির কাকলি আর কত ধরনের ছোটো-ছোটো বুনো জানোয়ারের ভীত চকিত ও বিস্মিত চলাফেরার শব্দ। গোড়ার দিকে ফ্যান কোনো জানোয়ার দেখলেই নিশানের মতো ল্যাজ তুলে ঘেউ-ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু শিকার নয়, সেইজন্মে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ফ্যানকে তারা নিরস্ত করলে। তাদের ঠেছে প্রথমে অস্তরীপের সেই পাহাড়টার ওদিকে পৌঁছে পূর্ব দিকে একেবারে সমুদ্রতীর অবধি যাওয়া। এতে অবিশি অনেকটা ঘুরে ঘেতে হবে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাতে এই অঞ্চলটার একটা স্পষ্ট ছবিও পাওয়া যাবে।

ডালপালা সরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে অবশেষে তারা একটা ছোটো পাহাড়ের কাছে পৌঁছলো। ঘুরে পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে না-গিয়ে তার উপরে ওঠাই তারা সমীচীন ব'লে স্থির করলে। কারণ সেখান থেকে চারদিকে তাকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।

অনেক কষ্টে শেষকালে তারা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠলো। ডোনাগান চোখে ছুরবিন লাগিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে। কই, আশেপাশে কোথাও সমুদ্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—কেবল পিছন দিকে তাকালে প্রবাল-প্রাচীরের পাশে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। উইলকল্প ও ছুরবিন লাগিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু না, কাছাকাছি কোথাও সমুদ্র আছে ব'লে মনে হ'লো না।

‘কিন্তু এটা ঠিক যে কোনো মহাদেশের অংশ, তা আমার মনে হয় না, উইলকল্প। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও সমুদ্র আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা একটা ছোটো দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে তো কত ছোটো দ্বীপ আছে, তার সবগুলিই যে মানচিত্র বা স্ফুগোল বইতে আছে, তা নয়। এটা হয়তো তেমনি কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ।’ ত্রিয়ী চিন্তিত স্বরে তার অভিমত ব্যক্ত করলে, ‘বরং এসো, সামনের জঙ্গলটা পেরিয়ে যাই—সোজা পূর্বদিকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখতে পাবো। আমার তো অন্তত তাই বিশ্বাস।’

‘সেই ভালো,’ সারভিস এ-কথার সায় দিলে, ‘আরেকটু এগিয়ে গিয়ে

দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে বনের মধ্যে ঢোকবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার, নইলে পা দুটো আর চলতে চাইবে না।’

তখন সবাই পাহাড় থেকে নেমে প্রথমে পেট ভরে সেই হুন-মাথানো কচ্ছপের মাংস খেয়ে নিলে, তারপর একটু বিশ্রাম করেই আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার একেবারে সোজাসুজি পূর্ব দিকে যেতে হবে।

এতক্ষণ পাহাড়ি রাস্তায় চলতে তাদের তেমন কষ্ট হয়নি, কিন্তু এখন বনের মধ্যে চলতে তাদের রীতিমতো কষ্ট হতে লাগলো। ঝোপঝাড় নিবিড় ও ঘন, কোনো রাস্তা নেই বলে এই বন্ধুর জমির উপর দিয়ে কখনো মাথা হুইয়ে, কখনো ডালপালা ধরিয়ে, কখনো-বা কুড়ুল দিয়ে ঝোপঝাড় সাফ করে যেতে তাদের কেবল অনেক সময়ই লাগলো না, বেশ অসুবিধেও হতে লাগলো।

শেষকালে সেই ঘন ঝোপ ঘন পেরিয়ে এলো তখন সন্ধে করে এসেছে। এখানে ঝোপঝাড় অনেক কম, গাছপালারও ততটা ঠেঁশাঠেঁশি ভিড় নেই; একটা কাঁকা জায়গা দেখে বেছে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে তারা। এই আগুনের কুণ্ডের পাশেই সারা রাত কাটাবে তারা—ভোরবেলায় আবার ছোটোহাজুরি সেরে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে।

পরদিন বেলা দুটোর সময় তারা একটা কাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলো—সেখান দিয়ে একটা ছোট পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। বড়জোর হাঁটু-জল নদীতে, কিন্তু স্বচ্ছ ঘন কাঁচ—এত টলটলে! তাকালে নিচের হুড়ি-পাথর দেখা যায়। পাহাড়ি নদী বলেই হোক কিংবা নিচে রাশি-রাশি পাথর বলেই হোক, এইটুকু ছোটো নদীর স্রোত কিন্তু বেশ প্রখর।

নদীর পাড় ধরে তারা খুব সহজেই অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলো। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা যখন দেখলে যে কে ঘন নদী পেরোবার জন্তে জলের মধ্যে সারি-সারি বড়ো পাথর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে, তখন তারা মন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হয়ে পড়লো। প্রকৃতি ঠাকরনের কি এতই দয়া যে কবে কোন কালে একদল ছেলে এই ছীপে এসে আশ্রয় নেবে বলে তাদের সুবিধের জন্তে এখানে এ-রকম ভাবে নদী পেরোবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন? না কি এটা যক্ষ্মা নামক বুদ্ধিমান জীবের কাণ্ড? তবে কি এখানে মানুষ থাকে?

হঠাৎ এই পাথরগুলো দেখে তারা আরো সাবধান হয়ে গেলো। চোখ কান খোলা রেখে ভালো করে চারপাশ দেখে-দেখে এগুতে লাগলো তারা।

কিন্তু সেদিনও সারাদিন অবিরাম হুটনের পর না দেখা গেলো সমুদ্র, না-

বা কোনো মনুষ্যমূর্তি । সন্ধ্যাবেলায় সারাদিনের পথশ্রমে ও ধকলে তারা আঁত
ক্লাস্ত ও বিধ্বস্ত তখন । তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে চিংপাত হ'য়ে
শুয়ে পড়ার মতো একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলো তারা ।

বেশিক্ষণ অবশ্য খুঁজতে হ'লো না তাদের । একটুক্কণের মধ্যেই দেখা গেলো
একটা প্রকাণ্ড গাছ—তার একটা মস্ত ডাল প্রচুর শাখাপ্রশাখা লতাপাতা
নিয়ে মাটি পর্যন্ত এমনভাবে লুয়ে পড়েছে যেন সেটা একটা কুঁড়ে বাড়ি ।
এখানেই তারা সে-রাত্রির মতো আশ্রয় নেবে ব'লে স্থির করলে ।

সকালবেলাটা সোনালি হ'য়ে দেখা দিলো । আকাশ ঝলমল করছে, চার-
দিক জ্যোতির্ময় । সবচেয়ে আগে ঘুম ভাঙলো সারভিসের । আড়মোড়া ভাঙতে
ভাঙতে উঠে বসলো সে চটপট, তারপর ম্যাজমেজে ভাবটা কাটাবার জন্যে
আস্তে-আস্তে সেই কুঁড়েবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো ।

তারপরেই শুরু হ'লো তার চিংকার : 'ত্রিয়'ী, ডোনাগান, উইলকক্স !
শিগগির এদিকে এসো !'

সকলে তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে আসতেই উত্তেজিত সারভিস হাত-পা
নেড়ে বললে, 'ওই ছাখো, সারা রাত আমরা কীসের তলায় কাটিয়েছি !'

সবাই তখন তাকিয়ে যে-দৃশ্য দেখতে পেলো, তাতে অস্তিত কিছুক্কণের জন্যে
কারু কোনো বাক্যস্মৃতি হ'লো না—কিয়ৎক্ষণ অস্তিত সবাইকেই স্তম্ভিত হ'য়ে
থাকতে হ'লো । যার তলায় তারা রাত্রিরটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, সেটা কোনো
শাখাবহুল গাছ নয়, একটা ছোট কুটির । এই অদ্ভুত কুটিরের হ'লো এই যে
এর কোনো দেয়াল নেই । গাছের গায়ে ঠেকানো চালটা চারধারে ঢালু হ'য়ে
নেমে গিয়েছে । আমেরিকায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই ধরনের ঘরে বাস করে ।
এই ধরনের কুঁড়েবাড়িকে তাবা বলে 'অ্যাজুপা' ।

অবশেষে প্রথম মস্তব্য করলে ডোনাগান, 'দ্বীপে তাহ'লে লোক আছে !'

'আপাতত না-থাকলেও,' বললে ত্রিয়'ী, 'অতীতে যে কখনও ছিলো
সে-বিষয় কোনো সন্দেহ নেই ।'

'এইবার বোঝা গেলো,' উইলকক্স মস্তব্য করলে, 'নদীর উপর কেন
অমনভাবে পাথর সাজানো রয়েছে ।'

দৃষ্টিরমতো চাঞ্চল্য বোধ করা সত্ত্বেও সেখানে আর দেরি না-করে তক্ষুনি
আবার তারা রওনা হ'য়ে পড়লো । কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর দেখা গেলো
বনের চেহারা একটু পালটে গেছে, এখন আর আগের মতো তেমন বড়ো-
বড়ো গাছ চোখে পড়ে না—কেবল মাথা-সমান উঁচু ঝোপঝাড় । একটু পরেই

সেই ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে তারা একটা বালুচরে এসে পৌঁছোলো। বালুচরের অল্প দূরেই এক তরঙ্গময় উদ্ভাল সমুদ্র তার অঙ্গুল ফেনা নিয়ে বেলাস্কুমির উপর আছড়ে পরছে।

ত্রিয়ঁর অনুমানই তবে সত্যি হ'লো! জায়গাটা তাহ'লে কোনো মহাদেশের অংশ নয়, সত্যি-সত্যিই একটা দ্বীপ!

এক অর্থে উদ্ধারের আশা অনেক ক'মে গেলো বটে, তবে অনিশ্চয়তা ও অস্থির হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেলো! অস্তিত্ব তারা কোথায় আছে সে-সম্বন্ধে তাদের আর কোনো বিভ্রম রইলো না। থাক, শেষ পর্যন্ত এটা তো জানা গেলো তারা কোথায় এসে উঠেছে—তাদের তদন্ত তো আর ব্যর্থ হয় নি, তবে আর খামকা দেরি ক'রে কী লাভ?

অল্প একটু জিরিয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে যাবে ব'লে স্থির করলো তারা। হঠাৎ এমন সময় ত্রিয়ঁর চোখ পড়লো ফ্যান-এর দিকে। কুকুরটা হঠাৎ কী মনে ক'রে যেন সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটে চলেছে। ত্রিয়ঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সারভিস ঘুরে তাকিয়ে ফ্যানের কাণ্ড দেখে চৈঁচিয়ে হাঁক পাড়লো, ফ্যান, ফ্যান, এদিকে আয়!

ফ্যান কিন্তু আদৌ তার হাঁকডাকে পাত্তা দিলে না, একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ফ্যান যে কাণ্ড করলে, তাতে তাদের বিশ্বয়ের আর সীমা রইলো না: ফ্যান তাঁরে দাঁড়িয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে চকচক ক'রে জল খাচ্ছে! সমুদ্রের জল তো লোনা, ফ্যান তা কী করে পান করছে?

বিশ্বয়ের ঘোর কাঁটতেই চারজনে অবাক হ'য়ে তীরে ছুটে গেলো। উইলকল্প এক আঁজলা জল নিয়ে মুখে দিয়ে চৈঁচিয়ে উঠলো: 'এ কী কাণ্ড! সমুদ্রের জল এত মিষ্টি, এত পরিষ্কার হ'লো কেমন ক'রে?'

তখন অন্তরাও সেই জল পান ক'রে দেখলো—অতি পরিষ্কার, টাটকা, মিষ্টি জল। যে-স্ববিস্তৃত জলরাশিকে তারা এতক্ষণ সমুদ্র ব'লে মনে করেছিলো, তা তবে সমুদ্র নয়, একটি দিগন্তবিসারী হ্রদ!

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হ'লো। দ্বীপ, না মহাদেশ সে-সম্বন্ধে এখনও কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল না। তাহ'লে আরো কিছু অনুসন্ধান না-ক'রে ফিরে যাওয়ার মানে হয় না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার তারা অনুসন্ধান বেয়িয়ে পড়বে ব'লে ঠিক করলো।

রাস্তিরটা এক জায়গায় কাটিয়ে পরদিন ভোর থেকেই আবার তাদের চলা শুরু হ'য়ে গেলো।

অনেকক্ষণ পরে একটা পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছোলো তারা ; ছোটো একটা নদীর কিনারা ঘেঁষে উঠেছে পাহাড়টা। নদীর দক্ষিণ পাড়ে মস্ত জলাভূমি—সেটা এত বড়ো যে তার কোনো কূলকিনারা দেখা গেলো না। নদী এখানে যেমন চওড়া, তেমনি গভীর।

ওরা অবিশি পাহাড়টায় ওঠবার চেষ্টা করলে না, বরং তার পাশ কাটিয়ে অল্পক্ষণ পরেই একটি সমতল ভূমির উপর গিয়ে পৌঁছোলো আর এমনসময়েই হঠাৎ কী-একটা জিনিশ দেখতে পেয়ে সারভিস বিস্মিত স্বরে চৈচিয়ে উঠলো।

সকলে তাকিয়ে দেখলে, কতগুলো বড়ো-বড়ো পাথরের আড়ালে একটা জীর্ণ নৌকো প'ড়ে আছে। নদীর তীর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। বছরের পর বছর একটানা রোদে-বৃষ্টিতে প'ড়ে থেকে নৌকোটোর আর-কিছুই অবশিষ্ট নেই। শাওলা-লাগা কাঠগুলো প'চে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে, কতদিন আগে যে নৌকোটা ব্যবহার্য অবস্থায় ছিলো তা পর্যন্ত তার এই দশা দেখে বোঝবার উপায় নেই।

ওই ভাঙা নৌকোটা দেখে ওদের মনের অবস্থা কী-রকম হয়ে উঠলো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের মনে হ'লো, কাছেই কোথাও নিশ্চয়ই বুনোরা ওৎ পেতে আছে, এই বুকি ছড়মুড় ক'রে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

এদিকে ফ্যানের রকমশকমও হঠাৎ কীরকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছে। কোলা কান-ছোটো খাড়া-খাড়া, ল্যাজটা নিশানের মতো শূণ্ণে তোলা, সমস্ত শরীরটা টান-টান। গরবু গরবু ক'রে চাপা গর্জন ক'রে একটু ছুটে যায় সে সামনে, পরক্ষণেই যেন ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে তাদের কাছে—গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। হঠাৎ কেন সে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে, তা তারা বুঝতে পারলে না।

এমন সময়ে হঠাৎ কাছের একটা পুরোনো বীচ গাছের গুঁড়ির উপর চোখ পড়লো ডোনাগানের। সেই গাছের গায়ে কে যেন ছুরি দিয়ে পরিষ্কারভাবে দুটি ইংরেজি হরফ খোদাই ক'রে রেখেছে, যেন কারু নামের আদ্য অক্ষর, আর তারই নিচে রোমান হরফে কতগুলো সংখ্যা খোদাই করা—সম্ভবত সালটা লিখে রাখা :

F. B.

1827

ভূতে-পাওয়ার মতো চারজনে সেই হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্যান কিন্তু তখনও তেমনি অস্থির হ'য়ে আছে। তার ভাবভঙ্গিতে আশস্ত হবার মতো কিছু নেই। রকমশকম দেখে ত্রিয়'া উদ্বিগ্ন গলায় বললে, 'খুব সাবধান, সামনে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আছে! ফ্যানের ভাবগতিক দেখে ব্যাপার খুব সুবিধের ঠেকছে না।'

চারজনে তখন বন্দুক উচিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে ফ্যানের পিছন-পিছন এগুতে লাগলো। খানিক দূর এগিয়ে একটা ঘন ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যান কেবল চাপা গর্জন করতে লাগলো। ত্রিয়'া একটু উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ভিতরে কোনো গুহা আছে ব'লে মনে হয়!'

ডোনাগানও ভালো ক'রে দেখে শুনে চাপা গলায় বললে, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

তক্ষুনি ত্রিয়'া মনস্থির ক'রে ফেললে। বললে, 'ভিতরটা একবার দেখা যাক।'

তখন দু'জনে কুড়ুল নিয়ে ঝোপঝাপ সাফ ক'রে ভিতরে ঢোকবার পথ ক'রে নিলে, আর বাকি দু'জন বন্দুক হাতে তৈরি হ'য়ে রইলো। পথ ক'রে নিলেও তক্ষুনি ঝোপের মধ্যে না-তুকে ভিতরে কী আছে, তা তারা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল ফ্যানের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে গরবু গরবু। এখনও ফ্যান তেমনি চঞ্চল, ঝুঁপু ও উত্তেজিত। খানিকক্ষণ চূপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় সাহসে বুক বেঁধে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। খানিকটা গিয়ে সবাই আবার সেই পাহাড়ের তলদেশে এসে হাজির।

এসে ছাখে, পাহাড়ের গায়ে বেশ বড়ো একটা গুহা। তবে গুহার ভিতরে ঢোকবার পথটা নিতান্তই ছোটো ও সংকীর্ণ। গুহাটা দেখে চারজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কী-রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো সকলের, ভয়ও যে হয়নি তাও নয়। কিন্তু জুজুর ভয়ে ডরাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া ভীতুর মতো জবুথবু হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই বা চলবে কেন? গুহার ভিতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখা খুব দরকার; হয়তো এই গুহাই ওদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হবে।

কিন্তু তাই ব'লে কোনো অঙ্ককার বায়ুশূন্য গহ্বরে তো আর গোঁয়াতু'মি করে ঢুকে পড়া যায় না! ভিতরটা যদি বিষাক্ত গ্যাসে ভরা থাকে, তাহ'লে যে একটুতেই প্রাণসংশয় হবে। অথবা বেপরোয়াভাবে শূন্যে ঝাঁপ খাওয়ার কোনো অর্থ নেই।

চূপচাপ দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবছে, এমন সময় ত্রিয়ার মাথায় একটা চমৎকার ফন্দি খেলে গেলো। চটপট কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে গুহার ভিতরে ফেলে দিলো সে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। সেই স্তূপীকৃত শুকনো পাতা আগুনের স্পর্শেই দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ত্রিয়া : 'যাক, ভেতরটা তবে বিষাক্ত গ্যাসে ভরা নয় !'

উইলকল্প এতক্ষণ চূপচাপ দাঁড়িয়ে ত্রিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। এবার সে ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলে, 'এই অন্ধকার অজানা গহ্বরের মধ্যে এক্ষুনি ঢুকবে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই,' ঘাড় নাড়লো ত্রিয়া।

'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস না থাকলেও ভিতরে তো কত বুনো জীবজন্তুও থাকতে পারে ?' বললে ডোনাগান, 'আরেকটু অপেক্ষা ক'রে সব দেখে শুনে নিলে হয় না কি ?'

'কী দরকার ? ওই বড়ো ডালটায় আগুন ধরিয়ে মশাল বানিয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে তো আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে—একেবারে খালি হাতে তো আর ভিতরে ঢুকছি না !' বলে ত্রিয়া মস্ত একটা শুকনো ডাল জ্বালিয়ে নিয়ে মশালের মতো হাতে তুলে নিলে।

মুখে খুব বেপরোয়া ও ডাকাবুকো কথা বললে কি হয়, এটা ঠিক যে ত্রিয়ারও বেশ ভয় করছিলো। তবু সে গুহার মধ্যে মশাল হাতে ঢুকে পড়লো—অতীরা চূপচাপ তাকে অনুসরণ করলে। ফ্যানও ল্যাজটাকে পায়ের ভিতর গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সঙ্গে চললো।

সকলেরই বুকে ভয়। কেমন একটা ছমছমে ভাব গুহাটার মধ্যে। বেশ বুক দুক্ৰদুক্ৰ করছে। একেবারে অজানা একটা পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে কী তাদের জন্ম প্রতীক্ষা করছে কে জানে। এটা আসলে তাদের মৃত্যুপুরী : অজ্ঞপ্ত অচেনা ভয় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে আচমকা।

গুহার প্রবেশ-পথটি চার ফুট উঁচু, ও দুই ফুট চওড়া। কিন্তু ভিতরটা বেশ সুপরিষ্কার, একটা হলঘরের মতো বড়ো। উচ্চতায় বারো ফুট, আর লম্বায় চওড়ায় পঁচিশ ফুটেরও বেশি—প্রায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো। মেঝেটা বালি আর শক্ত পাথরে ঢাকা।

মশালটা কিছুতেই ভালো জ্বলছিলো না। শিখাটা দপদপ ক'রে লাফাচ্ছিলো, আর সেইসঙ্গে মেঝেয় আর দেয়ালে তাদের ছায়াও। কিন্তু সব মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাদের ছায়াগুলো। হঠাৎ উইলকল্প সেই আবছায়ায় না-দেখতে পেয়ে

কীসের উপর যেন ছমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো। অন্তরা আলো নিয়ে হেঁট হ'য়ে দেখলো উইলকল্প যার গায়ে ধাকা খেয়েছে সেটা একটা কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চিটাকে দেখে তাদের আর বাকশুঁতি হ'লো না। এবার ভালো ক'রে আশপাশে তাকাতেই একটু দূরে একটা পুরোনো কাঠের টেবিল চোখে পড়লো তাদের। কাছে গিয়ে দেখলো টেবিলের উপরে রয়েছে একটা মাটির কলসি, দুটো খালা, একটা বড়ো ছুরি, একটা এনামেলের পেয়ালো, একটা পিতলের জগ ও মাছ ধরবার কিছু শরঞ্জাম। ওপাশের দেয়ালের কাছে একটা বড়ো কাঠের সিন্দুকও দেখা গেলো। টান দিতেই নড়বোড়ে ডালাটা ঝুলে গেলো, দেখা গেলো ভিতরে কয়েক প্রস্থ অতি জীর্ণ জামাকাপড় রয়েছে।

অতীতে কখনও যে এই গুহায় কোনো মানুষ থাকতো, তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না। কিন্তু সে কত কাল আগের কথা? কে থাকতো এই গুহায়—কে বা কারা? সেই লোকটি বা লোকজনদেরই বা কী হ'লো?

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানে না ব'লেই কেউ কোনো কথা বলছিলো না। চূপচাপ সব দেখতে-দেখতে হলঘরের অন্ত প্রান্তে এসে পড়লো তারা। পাথরের দেয়ালের গায়ে কেউ সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা বিছিয়ে একটা শয্যা প্রস্তুত করেছিলো বোধহয়—শিররের কাছে একটা টুল, তার উপর একটা কাঠের বাতিদান, মোম গ'লে-গ'লে তলায় গিয়ে জমা হ'য়ে আছে।

বিছানার উপর একটা চাদর বিছানো। ত্রিয়ার হাত বাড়িয়ে চাদর সরাতে গিয়ে কী মনে ক'রে হঠাৎ থমকে গেলো। হয়তো চাদর সরালেই একটা মৃতদেহ চোখে পড়বে। পরক্ষণেই বৃকে বল এনে টান মেরে সে ছেঁড়া চাদরটা তুলে ফেললো। না, বিছানার উপর কোনো মৃতদেহ প'ড়ে নেই।

এতক্ষণে হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'লো যে ফ্যান তাদের সঙ্গে নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সে সমানে চ্যাচামেচি ক'রে চলেছে। কোনো কথা না-ব'লে চারজনে এবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

সামনে কিছু দূরেই নদী। ছুয়ার থেকে নদীর তীর অবধি একটা ঘন ঝোপের সারি। ঝোপজঙ্গল সাফ ক'রে-ক'রে নদীর দিকে এগুবার চেষ্টা করলে তারা। মাত্র কয়েক পা এগিরেছে, অমন সময় একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সবাই ভয়ে চৌঁচিয়ে উঠেই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

একটা মস্ত বীচ গাছের গোড়ায় একরাশ হাড়গোড় প'ড়ে আছে। অস্থিসংস্থান দেখে বুঝতে অস্বীকৃতি হয় না যে মানুষের কঙ্কাল!

ফাঁসোয়া বদোয়াঁ

সেই ভীষণ নরকস্থল দেখে চারজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ-রকম একটা আশঙ্কা যে তারা মনে-মনে করেনি, তা নয়—কিন্তু তবু তাদের আশঙ্কাকে সত্য হ'তে দেখে কিছুক্ষণ তারা কোনো কথা বলতে পারলে না। একটু পরে, ঘোর খানিকটা কমলে, ধীরে-ধীরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে আরেকটু এগিয়ে দাঁড়ালো তারা। লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে চিত হ'য়ে শুয়ে মারা গিয়েছিলো, গোটা কঙ্কালটা এখনও তাই আশু আছে। তখনও ভয়ে তাদের বুক ছুরুছুরু করছে।

কে এই হতভাগ্য যে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে এই নির্জন দ্বীপে মৃত্যু ভয়ঙ্কর করেছ! সে কি কোনো ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিক? না কি কোনো সত্যাম্বেষী অভিযাত্রী? কোন দেশের লোক সে? বয়েসই বা কত ছিলো তার তখন? কত দিন কত মাস কত বছর না জানি এই জনহীন অস্ফাট দ্বীপে সে কাটিয়েছিলো! হয়তো যৌবনে কোনো-একদিন এই দ্বীপে এসে উঠেছিলো সে, তারপর বছরের পর বছর একা কাটিয়ে একেবারে বুড়ো হ'য়ে ফেলেছে শেষ নিশ্বাস!

এই নরকস্থলটি দেখে ত্রিয়ঁার সন্দেহই সত্য ব'লে মনে হয়। সত্যিই যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তাহ'লে এই হতভাগ্য নাবিক কেন একই জায়গায় সারা জীবন কাটিয়েছিলো! কেন সে পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো শহর বা জনপদে যাওয়ার চেষ্টা করেনি? সেদিকে যাওয়ার এমন কী দুর্লভ্য বাধা আছে যা সে অতিক্রম করতে পারেনি? না কি সে কোনো জায়গা থেকে পালিয়ে এসে এখানে লোকালয়ের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিলো? হয়তো মনুষ্য জাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মানুষের সংস্রব ত্যাগ ক'রে একা সারা জীবন কাটাবার সংকল্প নিয়ে সে এখানে এসে হাজির হয়েছিলো!

প্রশ্ন আরো অনেক ভিড় ক'রে আসছে মনের মধ্যে, কিন্তু কোনো সন্তুস্তর পেতে হ'লে সব-আগে বোধহয় সেই গুহার ভিতরটা খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। হয়তো সেখানে এমন কিছু নিদর্শন বা এমন-কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাবে, যা থেকে এই হতভাগ্য নাবিক ও তার জীবন সম্পর্কে অনেক দরকারি খবর পাওয়া যাবে। সেইসব খবর তাদের পক্ষেও কম জরুরি

নয়। আর সামনে যে রকম প্রচণ্ড শীত আসন্ন, তাতে এই গুহাও তাদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হ'তে পারে।

এইসব কথা ভেদে চারজনে ফের সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। অন্য-কোনো সময় হ'লে ডোনাগান হয়তো ত্রিয়ঁর কোনো নির্দেশই মান্য করতো না, কিন্তু এখন সব কিছু দেখে শুনে সে যেন কী-রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তাই এই সংকটের সময় সে আর কোনো দ্বিধাক্কা না-ক'রে ত্রিয়ঁর নির্দেশ মেনে চলতে লাগলো।

এবার তারা গুহার ভিতরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে লাগলো। একদিকে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের শেলফ, তার উপর অনেকগুলো মোমবাতি। মোমবাতিগুলো চ'বি আর মোম দিয়ে হাতে তৈরি—খুব সম্ভব ওই মৃত লোক-টারই কাজ। সারভিস একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখলে।

গুহাটা বেশ বড়ো। প্রাচীর শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝেও বেশ শুকনো খটখটে—মোটাই ভিজ্জে বা সঁাতসঁাতে নয়। বেরোবার দরজা কিন্তু সেই একটাই—নদীর দিকে মুখ। গুহার মধ্যে হাওয়া চলাচলের জন্যে আর একটা দুয়ার থাকলে ভালো হতো—ত্রিয়ঁ মনে মনে ভাবলে। তাহলে বিপদের সময়ে এই গুহাটাই তাদের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারবে, তাতে পনের জনের এখানেই কুলিয়ে যাবে।

গুহার জিনিশপত্রের একটা তালিকা তৈরি করলো ত্রিয়ঁ। নিতাস্তই সামান্য জিনিশপত্র। কী নিদারুণ অভাব আর দৈন্তের ভিতর এই হতভাগ্য লোকটিকে দিন কাটাতে হয়েছে! কতগুলি ভাঙা তক্তা, একটা কুড়ুল, একটা শাবল, একটা কোদাল, রান্নার দু-চারটে পাত্র, একটা হাতুড়ি—এই ছিলো তার সম্বল।

সব দেখে শুনে ত্রিয়ঁ মনে মনে সংকল্প স্থির ক'রে ফেললে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই গুহাই এখন থেকে আমাদের আশ্রয় হবে। একদা যখন এর মধ্যে লোক থাকতো তখন আমরাই বা পারবো না কেন?'

মুখে এ-কথা বললো বটে, কিন্তু তবু একবার তার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। বাইরের সেই নরককালটির ভয়ংকর কবরোটি যেন সেই গুহার আব-ছায়ার মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে এক ভীষণ গুম্ব মরা হাসিতে ভরে উঠেছে। সেই লোকটির মতো তারাও কি এই অজানা দেশে একে-একে মারা যাবে? শেষ অবধি যে যঁচে থাকবে, তার তখন কী ভয়াবহভাবে দিন কাটবে!...আচ্ছা, লোকটা মরেছে কীভাবে? কতদিন আগে? নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে—

গাছপালার সেই শুকনো, শুভ্র, মরা হাড়গুলো তো স্পষ্টই সে-কথা বলে। হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। কেননা গাছের গায়ে তো ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ করা আছে। এই পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর এই গুহায় পশার্ণ করেনি? এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়নি?

খুঁজতে-খুঁজতে আরেকটা বড়ো ছুরি পাওয়া গেলো। তারপর পাওয়া গেলো একটি বহু পুরনো কম্পাস। অবশেষে একটি চায়ের কেটলিও আবিষ্কার করা গেলো। কিন্তু জাহাজ চালাবার বা দিকনির্ণয় করবার আর-কোনো যন্ত্রই তারা সেখানে খুঁজে পেলো না। এমনকি একটা বন্দুক পর্বস্ত তাদের চোখে পড়লো না।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে চোখ পড়তেই মারভিস চোঁচিয়ে উঠলো, ‘গাখো, গাখো, ওটা কী?’

সেই অদ্ভুত জিনিশটা যে কী তারা প্রথমটায় বুঝতে পারলে না। তার পাশেই আবার সেইরকমই আরেকটি জিনিশ। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখে ত্রিয়ঁা অবশি শেষটায় জিনিশটা কী তা বুঝতে পারলে। প্রথম জিনিশটার নাম ‘বোলা’। বইয়ে পড়েছিলো, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই বোলার সাহায্যে নানা বুনো জানোয়ার ধরে থাকে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ির দু-দিকে দুটো বল বাঁধা; সেটা ছুঁড়ে তারা যে-কোনো জানোয়ার ধরতে পারে। এমনি তাদের অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্ত হাত যে তা ছুঁড়ে কোনো জানোয়ারের উপর নিক্ষেপ করলে জানোয়ারটি তক্ষুনি মাটিতে প’ড়ে যায় ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিমেষের জন্তে অবশ হ’য়ে পড়ে। তখন কাছে গিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা কিছুই নয়। অন্য জিনিশটার নাম ‘ল্যাসো’। ল্যাসোর সাহায্যে এমনকি বড়ো-বড়ো বুনো ঘোড়া পর্যন্ত পাকড়ানো যায়। এইবারে বোঝা গেলো লোকটা কী ক’রে বনের জীবজন্তু শিকার করতো। এই বোলা আর ল্যাসোর সাহায্যে লোকটার বন্দুকের অভাব কিছুটা দূর হয়েছিলো নিশ্চয়ই।

বিছানার বালিশপত্র সরাতেই একটা ছোট্ট স্কন্দর ঘড়ি দেখতে পেল তারা। রূপোর ঢাকনা ঘড়িটার, সঙ্গে রূপোর চেন আর রূপোর চাবি। অনেক কষ্টে ত্রিয়ঁা ঘড়িটার ঢাকনা খুলতে পারলো। ভিতরে সোনার কাঁটা—কোনো-এক তারিখে তিনটে কুড়ি মিনিটের সময় তার দম ফুরিয়েছে। ত্রিয়ঁা চাবি ঘুরিয়ে দম দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘড়ি তবু চললো না। ভিতরে কতদিন তেল পড়েনি কে জানে!

ডোনাগান বললে, ‘ঘড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই ঘড়ি-নির্মাতার নাম লেখা আছে। গাখো তো ভালো ক’রে!’

ইয়া, ত্রিয়ঁ লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেলো ঘড়ির ডালার উপর খুঁদে-খুঁদে হরফে লেখা রয়েছে, 'ছলপঁশ, সঁয়াং মালো'। ফরাশি নাম। বোঝা গেলো ফ্রান্সের কোনো কারখানায় ঘড়িটা তৈরি হয়েছিলো। লোকটি যে কোথাকার, তা কিন্তু তখনও অজ্ঞাত র'য়ে গেলো। সম্ভবত ফরাশি। স্বদেশি জিনিশ ছাড়া সে কি আর কোনো ভিনদেশি জিনিশ ব্যবহার করবে? কিন্তু এ-সম্বন্ধে—বলাই বাহুল্য—নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না।

অবশ্য তাদের সমস্ত সন্দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হ'লো। খুঁজতে-খুঁজতে শেষকালে তাদের হাতে পড়লো একটা নোটবই। ভিতরের কাগজগুলো একেবারে হলদে হ'য়ে গেছে। তাতে ফরাশি ভাষায় কী যেন লেখা। ত্রিয়ঁ প'ড়ে দেখলে, নোটবইয়ের প্রথম পাতায় নাম লেখা রয়েছে: 'ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁ'। যাক, লোকটা যে ফরাশি ছিলো, এবং আশুত্যা এই গুহাতেই বাস করেছিলো এ-বিষয়ে আর কোনো সংশয় নেই।

ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁ! এই নামের আদি অক্ষর দুটিই তো তারা সেই গাছেব গায়ে খোদিত দেখেছে।

খাতাটার পাতা উলটেপালটে ত্রিয়ঁ বুঝতে পারলে যে এটি আসলে বদোয়ঁর দিনলিপি। যে-দিন সে প্রথম দ্বীপে এসে উঠেছিলো, সেইদিন থেকে মৃত্যুর কয়েকদিন আগেকার ঘটনা পর্যন্ত সেই রোজনামচার পাতায় লেখা। তবে অনেকদিন আগেকার পেনসিলের লেখা ব'লে অনেক জায়গায় একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে একটা জাহাজের নাম: 'দুগুয়ে ক্রয়ঁ'। নিশ্চয়ই এই জাহাজে সে কাজ করতো, আর জাহাজটা ডুবে গিয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে। খাতার গোড়ার দিকে আবার সেই ১৮২৭ সালের উল্লেখ দেখা গেলো, ঠিক যে-সাল গাছেব গায়ে খোদাই করা আছে। অর্থাৎ প্রায় তেত্রিশ বছর আগে ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁ এই দ্বীপে পদার্পণ করে। সেই জাহাজডুবির পর বেচারি বাইরে থেকে উদ্ধারের কোনো সাহায্যই আর পায়নি, তাই মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত এই দ্বীপে তাকে একা কাটাতে হয়েছিলো কোনো নতুন রবিনসন ক্রুসোর মতো। এইসব কথা জেনে তাদের মনেও রীতিমতো হুঁচিলা ও হতাশা জেগে উঠলো। হয়তো তাদের জন্তুও এই দুর্দশা ভবিষ্যতের বাস্তু তোলা আছে!

খাতাটা নাড়াচাড়া করতে ভিতর থেকে একটা মস্ত ভাঁজ-করা কাগজ মেঝের প'ড়ে গেলো। উইলকল্প সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, হাতে-আঁকা একটা বিরাট মানচিত্র। অতি বিস্তীর্ণ কালিতে আঁকা, কিন্তু অল্পপুঙ্খগুলো বেশ

স্পষ্ট। বদোয়ী নিশ্চয়ই দ্বীপে আসবার পর এখানকারই কোনো লতাপাতার রস দিয়ে এই কালি তৈরি করেছিলো।

উইলকক্স বললে, ‘বদোয়ী যখন ম্যাপ তৈরি করতে পারতো, তখন সে তো নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ নাবিক ছিলো না। সম্ভবত জাহাজের কোনো উঁচু দরের অফিসার ছিলো সে।’

‘আমারও তাই মনে হয়,’ বললে ডোনাগান। ‘কিন্তু ম্যাপটা কোন দেশের, বুঝতে পারছো, ব্রিয়ঁ?’

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে ব্রিয়ঁ বললে, ‘আমার তো মনে হচ্ছে এটা এখানকারই ম্যাপ। এই ছাখো, এখানটায় আমাদের জাহাজ আছে। এই সেই উপসাগর, এখানটায় ছাখো সেই প্রবালশ্রেণী। এই ছাখো সেই হৃদটা, যাকে আমরা সমুদ্র বলে ভুল করেছিলুম। এটা হচ্ছে দ্বীপের মাঝখানকার সেই গভীর অরণ্য, যার মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। হৃদটা কিন্তু যতটা বড়ো ভেবেছিলুম, তেমন নয়। হৃদের ওপারেই ভীষণ জঙ্গল আঁকা রয়েছে—আর তার ওপারেই এই ছাখো নীল রঙে সমুদ্র আঁকা।’

‘তাই’লে তো পূর্বদিকে আর বেশি এগুনো সম্ভব হবে না,’ সব শুনে সারভিস বললে, ‘আর এইবারে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্রিয়ঁর অনুমানই ঠিক—আমরা যার উপর উঠেছি সেটা একটা সামান্য দ্বীপ। মহাদেশ মহাদেশ করে আমরা মিথোই এতদিন কেবল মাথা ঘামালুম।’

ম্যাপ থেকে আরো-একটা জিনিস স্পষ্ট হ’লো : দ্বীপটা বহুতল নয়, আয়ত—ঠিক যেন একটা প্রজাপতি জলে ডানা ছড়িয়ে ভাসছে। দ্বীপের মাঝখানে এক গভীর অরণ্য—আর অরণ্যের ঠিক মাঝামাঝি সেই হৃদটা। অর্থাৎ হৃদের এপারেও যেমন গভীর বন, ওপারেও তেমনি। হৃদটা নিতান্ত ছোটো নয়, দৈর্ঘ্যে পনেরো মাইল, চওড়ায় পাঁচ-ছ মাইলের মতো। এত বড়ো হৃদকে সমুদ্র বলে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

ম্যাপ দেখে আরো বোঝা গেলো, দ্বীপটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ মাইল, আর পূর্ব-পশ্চিমে ঠিক তার অর্ধেক। কিন্তু দ্বীপটা যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে অবস্থিত, তা ম্যাপ থেকে বোঝা গেলো না। কোনো অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা রেখার উল্লেখ নেই।

তবে সবকিছু দেখে-শুনে এটা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারলে যে, এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দ্বীপের উপর এখনও অনেক দিন তাদের কাটাতে হবে। দ্বীপটা সম্ভবত সমুদ্রের এমন জায়গায় অবস্থিত যার কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ

ধাতায়াত করে না। এখন এই গুহার মধ্যে এসে সদলবলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া তাদের আর-কোনো উপায় নেই। সুতরাং অসখা আর কালক্ষেপনা-ক'রে জাহাজ থেকে সব জিনিশপত্র গুহার মধ্যে নিয়ে আসাই হবে তাদের প্রথম কর্তব্য।

আজ তিন দিন হ'লো ত্রিয়ঁরা জাহাজ ছেড়ে অগ্নিসঙ্কানে বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই গরডন ওদিকে এতক্ষণে তাদের জন্তে খুব চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং আর দেরি না-ক'রে এবারে সত্যি ফেরা উচিত।

ম্যাপটা দেখতে দেখতে ত্রিয়ঁ বললে, 'এখন আর বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাজ নেই—কারণ ম্যাপে স্পষ্টই বলেছে এই নদীর তীর ধ'রে গেলে সবচেয়ে আগে আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছবো। বড়োজোর সাত মাইল পথ হবে। এটুকু রাস্তা আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেরোতে পারবো। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে আমাদের আরেকটা কর্তব্য আছে। ঝাঁর কল্যাণে আমরা এই দ্বীপ সম্বন্ধে এত তথ্য জানতে পারলুম, তাঁর আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের আশু কর্তব্য।'

চারজনে মিলে সেই বীচ গাছের তলায় একটা কবর খুঁড়ে ফ্রাসোয়া বদোয়ঁর কঙ্কালটি টেনে এনে সমাহিত করলে। কবরের উপরে একটা কাঠের ক্রুস পুঁতে দিতেও তারা ক্রটি করলো না। তারপর তারা গুহার সামনে ফিরে এসে গুহার দুয়ার ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে, যাতে কোনো বুনো জানোয়ার পথ খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে আস্তানা গাড়তে না পারে। এখন থেকে এই গুহাই তো হবে তাদের প্রধান আশ্রয়।

সেখান থেকে নদীর ধারে গিয়ে তারা নদীর ডান তীর ধরে পশ্চিমমুখে রওনা হ'য়ে পড়লো।

চলতে চলতে দিনের আলো নিভে গেলো, অন্ধকার ক'রে এলো চারদিক, রাত হ'লো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। চারদিকে বনের মধ্যে কত ভয়-ধরানো শব্দ। রাত্তিরে আবার সামান্য শব্দও অনেক ছমছমে সম্ভাবনা জাগিয়ে দেয়। ডোনাগানরা ত্রিয়ঁকে অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু ত্রিয়ঁ তাদের সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা ক'রে সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

এখন আর বন তেমন নিবিড় নয়। চারদিক বেশ ফাঁকা, কিন্তু কী ভীষণ অন্ধকার! হঠাৎ ত্রিয়ঁর চোখে পড়লো, গাছপালার আড়ালে দূর দিগন্তে একটা আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। সেই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে অমন টকটকে লাল আলো দেখে প্রথমে সে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

সারভিস ক্রক স্বরে জিগেস করলে, 'ত্রিয়ঁ, ওটা কী?'

ফিশফিশ ক'রে চাপা গলায় ডোনাগান জানালে, 'আকাশের উচ্চা ব'লে মনে হচ্ছে। দেখছো না কত উপরে জ্বলছে !'

সত্যি আলোটা আকাশেই জ্বলছিলো। ত্রিয়ঁ। কিন্তু আদৌ বিচলিত হয়নি, ভালো ক'রে দেখে খুব সহজ গলায় বললে, 'তোমাদের এত ভয় কেন, ডোনাগান ? ও আগুন তো জাহাজের ছেলেরা জ্বলেছে—নিশ্চয়ই গরডনের কাজ। আমাদের পথ দেখাবার জন্যে হাউই ছেড়েছে।'

ত্রিয়ঁর আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, তা তারা একটু পরেই বুঝতে পারলে। তখন ডোনাগান সংকেত ক'রে বন্দুকের শব্দ করলে। এক মিনিট পরেই জাহাজ থেকে পাণ্টা ফাঁকা আওয়াজ হ'লো সংকেতের উত্তর হিসেবে।

যাক, গরডন তবে বুঝতে পেরেছে যে ওরা এত রাতে ফিরছে। গরডনদের দুর্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে।

হনহন ক'রে চ'লে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজের কাছে এসে পৌঁছোলো তারা।

আশ্রয় বদল

চার ঘূর্তির পুনরাবির্ভাবে অবশেষে জাহাজের অন্য ছেলেরা ইঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এই ক-দিন কী দুশ্চিন্তাতেই যে কেটেছে ওদের !

সকলেরই কৌতূহল চরিতার্থ করলো ত্রিয়ঁ।। তদন্তের ফলাফল জানবার জন্যে তারা ইঁশফাঁশ করছিলো। ত্রিয়ঁ। তাদের খুঁটিনাটি সমেত এ ক-দিনের পুরো বিবরণ শোনাল। তখন সবাই মিলে একটা পরামর্শসভা বসলো : কী ক'রে জাহাজের সব মালপত্র পাহাড়ের সেই গুহায় নিয়ে যাওয়া যায়, এটাই তাদের প্রধান আলোচ্য।

প্রথমেই গরডন বললে, 'দেরি-টেরি ক'রে আর কোনো লাভ নেই। চটপট আমাদের সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। এদিকে জাহাজের যা হাল হয়েছে, তাতে খুব-একটা ভরসা পাওয়ার কিছু নেই। একটানা বুষ্টির জলে ভিজ়ে আর এ-কদিন রোদে পুড়ে সমস্ত তক্তা একেবারে ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে গেছে—ঝড়ের পাল্লায় প'ড়েও বা ষেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, এখন আর তাও নেই। শীতের সময় এখানে থাকলে কাউকে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওদিকে আবার জাহাজটা দিনের পর দিন আরো কাত হ'য়ে পড়ছে।'

‘এখন একটা ঝড় উঠলে আর দেখতে হবে না,’—বললে গারনেট, জাহাজটার মালিক আসলে তারই বাবা, ‘জাহাজের সব তক্তাগুলো দশ দিকে উড়ে যাবে, আর আমরাও প্রাণে মরবো। জাহাজটা বাবার খুব প্রিয় ছিলো—তার যে শেষকালে এমন দশা হয়েছে, তা যদি তিনি চোখে দেখতেন তাহ’লে আর দুঃখের সীমা থাকতো না। আমরা বরং এখন যদি জাহাজের সব তক্তা, কাঠ, কড়ি, লোহালকড় সমস্তই সেই গুহায় নিয়ে যাই, তাহ’লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে এ-সব দিয়ে বেশ ঘর আর আশবাবপত্র বানানো যাবে—তবু তো জিনিশগুলোর একটা সঙ্গতি হবে!’

জেনকিন্স বললে, ‘আমাদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের জন্তে কিন্তু গুহাটার একটা নাম ঠিক করা উচিত।’

‘ঠিক বলেছো,’ ডোনাগান সায় দিলে, ‘সেই ফরাশি নাবিকের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গুহার নাম হোক ফরাশি গুহা।’

ব্রিয়ঁ আর গরডন সমন্বরে সম্মতি প্রকাশ করল, ‘বেশ, আজ থেকে তার তাই নাম হ’লো।’

ডোনাগান বললে, ‘কিন্তু সব মালপত্র সরাতে তো আর কম দিন লাগবে না। তত দিন আমরা রাত কাটাবো কোথায়?’

‘কেন? তাঁবু খাটিয়ে।’ গরডন বাতলালে, ‘নদীর ধারে কোনো গাছতলায় তাঁবু খাটালেই চলবে।’

ব্রিয়ঁ উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললে, ‘সেই ঠিক। আর দেরি না ক’রে কাল সকাল থেকেই যাত্রার আয়োজন করা যাবে। এখন সবাই গিয়ে শুয়ে পড়ো—কাল অনেক কাজ, ভালো ক’রে বিশ্রাম না-করলে এত ধকল তোমরা সহিতে পারবে না।’

পরদিন সকালে প্রথমেই গরডন সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্তে বুদ্ধি ক’রে নদীর তীরে একটা তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলে। জাহাজের অত জিনিশ জঙ্গলের পথে বা নদীর তীর ধ’রে কাঁধে ক’রে বয়ে নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, কেবলমাত্র নদীপথ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বর্ষার পরে নদী তখন কানায়-কানায় ভরা—অনায়াসেই ভেলায় ক’রে সব জিনিশ নিয়ে যাওয়া যাবে।

সবাই মিলে লেগে থেকে অবশেষে এক-এক ক’রে জাহাজ থেকে সব মালপত্র নামিয়ে ফেললে। এইবারে জাহাজটা ভাঙতে হবে। নেহাত সহজ নয় কাজটা। অনেক কষ্টে সাঁড়াশি, শাবল, গাঁইতি আর হাতুড়ির সাহায্যে প্রথমে

জাহাজের তলার পেতলের পরদাটা খুলে ফেলা হ'লো। বড়ো-বড়ো ছক আর ইকুপগুলো খুলতে বেশ বেগ পেতে হ'লো অবিশ্বি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর সে-কাজটাও সম্পন্ন করা গেলো। তারপর জাহাজের খোলের তক্তাগুলো আশে-আশে খোলা হ'তে লাগলো। সে যে কত অসংখ্য তক্তা, একটা গোটা জাহাজ দেখে তা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না—বোঝা-ই যায় না যে এত কাঠ এতে লেগেছিলো। এই তক্তাগুলো খুলতেই তাদের অনেক দিন লেগে যেতো, যদি না প্রকৃতি হঠাৎ তাদের সহায় হ'তো।

এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন বিকেল থেকেই আকাশ কালো হ'য়ে আসছিলো। বলা নেই কওয়া নেই চারদিক থেকে যত বাজ্যের মেঘ এসে সেই দ্বীপের উপর জমা হচ্ছিলো, দিন থাকতেই অন্ধকার ক'রে ছিলো চারদিক। তারপর সন্ধ্যা নামবার আগেই বিষম ঝড়বুষ্টি শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো।

গতিক আদৌ সুবিধের ঠেকছিলো না। ছেলেরা জাহাজ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলে। নদীর তীরে কতগুলো গাছের নিচে তারা তাঁবু ফেলেছিলো। গাছের ডালে-ডালে তাঁবুর দড়ি বাঁধা। সেই-জন্মেই বোধহয় সে-রাতে তারা ঝড়ের দাপট ঠিক ক'রে বুঝতে পারেনি। ভোর রাত পর্যন্ত সমানে ঝড় গরজালো। তারপর সকালবেলায় হঠাৎ ঝড় থেমে গেলো। বুষ্টিও রইলো না। সবাই তখন এসে দাঁখে—কী সাংঘাতিক! ঝড় পুরোপুরি থেমে গেছে বটে, কিন্তু গোটা দ্বীপের উপর ধ্বংসের কী চিহ্নই না রেখে গেছে! জাহাজের তক্তাগুলো সব খুলে চারদিকে ছত্রগান হয়ে ছড়িয়ে আছে—আশু কাঠামোটাই ভেঙে চুরমার।

এই ধ্বংসের দৃশ্য অবিশ্বি তাদের মনে আনন্দই সৃষ্টি করলো। ভাগ্যে ঝড় এসেছিলো, তাইতেই তো অনেক পরিশ্রমের হাত থেকে বেহাই পাওয়া গেলো!

এইবারে ভেলা তৈরি করবাব পালা। জাহাজের কাঠগুলো সব এই কাজেই লাগলো। অনেক চেষ্টার পর একটা বিরাট ভেলা তৈরি করলে তারা। লম্বায় প্রায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় তার অর্ধেক। বেশ সুন্দর ভেসে থাকলো জলের উপর।

ভেলাটাকে যখন তারা জলে ভাসিয়েছিলো, তখন জোয়ারের টান শুরু হয়েছে। চঞ্চল জলের উপর ভেলাটাও যেন ভেসে যেতে চেয়ে অস্থির হ'য়ে উঠছিলো বারে-বারে। তাই তারা একগাছা শক্ত দড়ি দিয়ে ভেলাটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখলো।

পরের দিন সকালবেলায় তারা ভেলার উপর একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈরি

করলে। ডেকের হালকা (কিন্তু মোটেই পলকা নয়) তক্তাগুলো দিয়ে সহজেই সেই প্ল্যাটফর্মটি তারা তৈরি করতে পারলে। তারপর বড়ো-বড়ো পেরেক মেরে আর মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সমস্ত ভেলাটাকেই খুব মজবুত করা হ'লো।

তৃতীয় দিনে শুরু হ'লো ভেলাব উপর মাল বোঝাই করার কাজ : সেদিন দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছিলো, তারই মধ্যে শীতে হি-হি করতে করতে সবাই একে-একে সব জিনিশ ভেলায় তুলে ফেললে।

বিকেলে সব মালপত্র ভেলায় চাপানো হ'লে পর ত্রিয়'ী বললে, 'সবই তো হ'লো—চল, আমরা পরশুই নতুন আস্তানার উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়ি।'

'আবার পরশু কেন ?' জিগেস করল গরডন, 'ভেলায় তো সব কিছুই তোলা হয়েছে—এদিকেও আর-কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে কালকেই ভেলা ছাড়া যায়।'

'না, কাল আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না।' বললে ত্রিয়'ী, 'কারণ পরশু দিন অমাবস্যা। সেদিন নদীতে খুব জোর জোয়ার আসবে। ভেলা তো আর কম ভারি হয়নি—দাঁড় টেনে নিয়ে যেতে বেশ সময় লাগবে—তাছাড়া খামকা ক্লাস্তও হ'য়ে পড়বে সবাই। জোয়ারের টানে এদিকে ভেলা সহজেই ভেসে যাবে। কাজেই—'

'সে-কথা ঠিক,' বললে গরডন, 'তাহ'লে পরশুই রওনা হ'য়ে পড়বো, কী বলো !'

কিন্তু পরদিন ত্রিয়'ী হঠাৎ এমন-একটা জিনিশ আবিষ্কার করলে যাতে তার মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো।

সকালবেলায় নদীর ধারে গিয়েছিলো ত্রিয়'ী। হঠাৎ দেখলে নদীর তীরের সমুদ্রশৈবালের মধ্যে চাপ-চাপ শাদা বরফ ভাসছে। কে জানে, হয়তো ফরাশি গুহায় পৌঁছবার আগেই সমস্ত নদী বরফে জ'মে যাবে! হয়তো এটা স্বদূর অ্যান্টার্কটিক মহাসাগরের কোনো দ্বীপ। কিন্তু এখন তো আর সে-সব নিয়ে ভাববার সময় নেই—একুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।

রওনা হওয়ার আগে অবিশি ছোটো একটা অধিবেশন হ'লো। ত্রিয়'ী সবাইকে ডেকে বললে, 'সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা এখন ফরাশি গুহায় থাকতে চলেছি—কত দিন সেখানে থাকতে হবে জানি না—হয়তো দীর্ঘকাল। অত দূর থেকে বনের ভিতর দিয়ে যখন-তখন আমরা এই সমুদ্রতীরে আসতে পারবো না—আর ফরাশি গুহা থেকে আবার সমুদ্রও চোখে পড়ে না। কাজেই দ্বীপের কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ গেলেও আমরা জানতে পারবো না। অথচ এই দ্বীপ

থেকে পরিজ্ঞাণ পেতে হ'লে আমাদের এখন এমনিতর কোনো সাহায্যের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। তাই আমার মতে, সমুদ্রতীরে সবচেয়ে লম্বা মাঙ্গলটা পুঁতে তার উপর জাহাজের বড়ো নিশানটা উড়িয়ে রাখা যাক—ওই নিশান দেখে হয়তো কোনো জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারবে দ্বীপে এসে কারা আশ্রয় নিয়েছে।'

কোনো ঝিক্কা না-ক'রেই সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলো। আর যেই সিদ্ধান্ত নেয়া, অমনি আর দেরি নয়—হুড়মুড় ক'রে সবাই মিলে জাহাজের সবচেয়ে লম্বা মাঙ্গলটাকে সমুদ্রতীরে টেনে নিয়ে গেলো, আর তার উপর জাহাজের একটা মস্ত নিশান উড়িয়ে দিলো। সমুদ্রের হাওয়ায় সেই বিশাল পতাকা পতপত ক'রে উড়তে লাগলো।

ততক্ষণে বেলা সাতটা বেজে গিয়েছে। অথচ তবু জোয়ারের কোনো দেখা নেই। নদীর জল শান্ত, ঠাণ্ডা, কানায়-কানায় ভরা। জোয়ার না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব'লেই তারা ঠিক করেছিলো, কিন্তু ক্রমে বেলা আটটা বেজে গেলো, রোদও বেশ কড়া হ'য়ে উঠলো, কিন্তু জোয়ারের কোনো চিহ্ন মিলল না। ছোটোরা ক্রমশ অর্ধৈর্ষ হ'য়ে উঠলো, এরকম চূপচাপ হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে কারই বা ভাল লাগে ?

কিন্তু হঠাৎ ন-টার সময়ে ভেলার কাঠগুলোয় হিশ-হিশ শব্দ হ'তে থাকলো। নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে। তক্ষুনি ত্রিয়'রা চৌচিয়ে সবাইকে তৈরি থাকতে ব'লে ভেলা থেকে তীরে লাফিয়ে পড়লো, তারপর গাছের দড়ি খুলে দিয়ে দ্রুতপায়ে আবার ভেলার উপর লাফিয়ে উঠলো। বন্ধনমুক্ত হ'তেই ভেলা আশ্বে-আশ্বে ভেসে চললো। তখনও যেহেতু ভালো ক'রে জোয়ার শুরু হয়নি, জলে যেহেতু তখনও তেমন চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি, সেইজন্মে ভেলার গতি তেমন বাড়তে পেলো না। ত্রিয়'রা চারজনে চার কোণে দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে ডাঙায় গিয়ে ধাক্কা না খায় ভেলা।

পর-পর কয়েক দিন কয়েক রাত অবিরাম ভেলা চালিয়ে একদিন বেলা তিনটের সময় তারা ফরাশি গুহার কাছে নদীর তীরে এসে পৌঁছোলো। সামনেই সেই দিগন্ত-ছোঁয়া তুষারশীতল গভীর হ্রদ : একটার পর একটা ঢেউ উঠছে-ভাঙছে, বড়ো-বড়ো ঢেউগুলো মশক্কে এসে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমিতে।

ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে ফরাশি গুহার সামনে লাফিয়ে নামলো।

ডাঙায় নেমে ছেলেদের আনন্দের সীমা স্থাপ্তি কে ? তাদের জন্মে ঘন একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, আজ তাদের গৃহপ্রবেশের উৎসব !

তাদের কোলাহলে সেই নির্জন বেলাভূমি মুখর হ'য়ে উঠলো। কলরোল তুলে তারা এসে ঢুকলো ফরাশি গুহায়। বিশেষ ক'রে যারা এখনও গুহাটা ছাখেনি, তারা এই কয়েক দিন ভিতরটা একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে ছিলো। বুদ্ধি ক'রে মোকো ভেলা থেকে একটা বাতি নিয়ে এসেছিলো। সেই বাতির আলোয় গুহার চারদিক ঝলমল ক'রে উঠলো। আগে মশাল জ্বলে তারা তেমন ভালোভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ ক'রে যেতে পারেনি। এখন মনে হ'লো তারা যেন একটা মস্ত হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

‘এতগুলো লোক এই চোর-কুঠুরির মধ্যে কী ক'রে থাকবে?’ গুহার ভিতরটা দেখেই বাব্বটার ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে উঠলো, ‘আমার যে এর মধ্যেই দম বন্ধ হ'য়ে আসছে! এখানে পনেরোটা বিছানা পড়লে আমরা নড়াচড়াই বা করবো কী ক'রে?’

‘এর চেয়ে একটা ভালো ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারো?’ হেসে জিগেস করলো ত্রিয়ী : ‘পারো তো বলো, আমরা সেখানে গিয়েই থাকবো।’

‘কিন্তু এর মধ্যে রান্না-বান্না চলবে কী ক'রে?’ তবু খুঁতখুঁত করলো ডোনাগান, ‘ধোঁয়ায় যে দম আটকে মরতে হবে!’

‘ভিতরে রান্নার ব্যবস্থা না-করলেই হ'লো,’ বললে মোকো, ‘দুয়ারের পাশে বাইরে রান্না করলেই চলবে।’

‘আপাতত তা চলতে পারে,’ ত্রিয়ী বললে, ‘কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার দিনে তো আর তা চলবে না। তা ছাড়া আমার মনে হয় বাইরের সংস্রব একেবারে ছেড়ে দেয়াই ভালো। আমাদের রান্নাবান্না হবে স্টোভে—তাতে তো আর ধোঁয়ার ভয় নেই। সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচটা স্টোভ আছে, তাছাড়া স্পিরিট আর কেরোসিনও আছে যথেষ্ট!’

‘কিন্তু যদি মাথা ধরে?’ বললে ডোনাগান।

সারভিস বললে, ‘লর্ড ডোনাগান, মাথা ধরলে স্মেলিং সন্ট ব্যবহার কোরো।’

‘করবোই তো,’ ডোনাগান চ'টে উঠলো, ‘তাতে তোমার কী, খানশামা-মশাই?’

ঝগড়া প্রায় বেধে ওঠে দেখে গরডন মাঝখানে পড়লো। বলল, ‘থাক, এখন ঝগড়া করবার সময় নয়। আর এটাও সত্যি—এইটুকু জায়গায় রান্না-বান্না খাওয়-দাওয়া শোয়া-বসা চালানো খুবই কষ্টের কাজ হবে। পরে আমাদের একটা আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতেই হবে। আশপাশের দেয়াল খুঁড়ে

দেখতে হবে কোনো দিকে কোনো নতুন আশ্রয় পাওয়া যায় কি না। সামনে এখন লম্বা শীতকাল। ঠাণ্ডার মধ্যে তো আর বেকবাব কোনো উপায় থাকবে না আমাদের, তখন সারা দিন ধ'রে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে তদন্ত চালানো যাবে'খন।'

'কিন্তু এখন আমাদের সামনে অনেক কাজ,' বললে ত্রিয়ণী, 'প্রথম, ভেলা থেকে জিনিশপত্রগুলো নিয়ে আসতে হবে গুহার। তারপর সেগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে আমাদের—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো,' বললো গরডন।

তখন সবাই মিলে হৈ-চৈ করতে-করতে আবার ভেলায় গিয়ে উঠলো।

প্রথমে ভেলা থেকে নিয়ে আসা হ'লো বিছানাপত্র, তারপর কিছু হালকা তক্তা। গুহার পাথরের মেঝের উপর প্রচুর শুকনো বালি বিছানো, তার উপর তক্তা বিছিয়ে তারা পাশাপাশি সকলের বিছানা পাতলো। জাহাজের বড়ো টেবিলটা এনে রাখা হ'লো গুহার মাঝখানে। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে টেবিল-ঢাকার ব্যবস্থা করল তারা। তারপর অগ্ন্যাশ্রয় শরণাম আনলো তারা ভেলা থেকে। এক কোণে কিছু কাঠ সাজিয়ে একটা চুল্লি বানানো হ'লো। রাত্রে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়বে—এই ক-দিনে ভেলায় তারা ঠাণ্ডার কাঁপুনি বেশ মর্মে-মর্মে টের পেয়েছে। সেইজন্যে গুহার মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জালিয়ে রাখা ভালো। গুহার বাইরে গাছতলায় প্রচুর শুকনো ডালপালা প'ড়ে আছে—কাজেই জ্বালানি কাঠের অভাব তাদের সহজে হবে না। রাত্রে মোকোর হাতে রান্না মুখরোচক বাসটার্ডের মাংস! ঠিক যেন সত্যিকার গৃহপ্রবেশ!

ছেলেরা ফরাশি গুহার এসেছে যে মাসের আট তারিখে। তারপরে তিন-চার দিন ধ'রে তারা আর অণু কোনো কিছুর দিকে মন দেয়ার অবসর পায়নি। ভেলা থেকে সমস্ত জিনিশপত্র গুহার এনে তুলতেই তাদের এই ক-দিন কেটে গেছে। ওদিকে আকাশ-বাতাস হিমেল কুয়াশায় ভ'রে উঠতে শুরু করেছে। হাওয়া যেন ঠাণ্ডা কনকনে কোনো ছুরি—কেটে-কেটে বসে গিয়ে। ঠাণ্ডায় বেশ কষ্ট হচ্ছে সকলের—গাল ফেটে যাচ্ছে, রক্ত পড়ছে তাদের—গ্লিসারিন আর গ্রাজ মালিশ ক'রেও গা-ফাটা থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। শিগগিরই যে মহোৎসবে তুষারপাত শুরু হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বরফ পড়বার আগেই সব জিনিশপত্র গুহার নিয়ে আসা দরকার—তাই হু-বেলা না বেরিয়েই বা উপায় কী?

একেক দিন ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব, উইলকক্স আর বাস্কার বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরতো। প্রত্যেক দিনই তাদের ভাগ্যে প্রচুর শিকার জুটতো। স্নাইপ, বালিহাস, জলপিপি, বুনোমুরগি। একদিন তারা একটু বেশি দূরে গিয়েছিলো। সেখানে কেবল বাঁচ আর বীচ গাছের কাঁক। তারা অবাক হ'য়ে দেখতে পেলো, চারদিকে স্পষ্ট মনুষ্যবাসের চিহ্ন। কোথাও একটা ভাঙা চালাঘর, কোথাও-বা মাটিতে বড়ো-বড়ো গর্ত খোঁড়া; গর্তের উপর সরু-সরু ডালপালা বিছানো। সেগুলো যে বুনো জানোয়ার ধরবার কাঁদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব গভীর গর্ত, ভিতবে কোনো জানোয়ার পড়লে আর উঠে পালাতে পারবে না। একটা গর্তের মধ্যে তারা একটা বড়ো জানোয়ারের আঁস্ত কঙ্কাল দেখতে পেলো। কিন্তু কঙ্কাল দেখে বোঝা গেলো না সেটা কী, বা কোন জাতের জানোয়ার।

উইলকক্স তক্ষুনি সেই গর্তের মধ্যে নেমে গিয়েছিলো সরেজমিন তদন্ত করতে। ভালো ক'রে কঙ্কালটা পরীক্ষা ক'রে সে বললে, 'উহু, কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না কী জানোয়ার! তবে, এটা কী অস্ত্র তা বোঝা না-গেলেও প্রকাণ্ড কোনো জন্তু যে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাড়গোড় এমন কাঁকরা হ'য়ে গেছে যে মনে হচ্ছে জানোয়ারটা কাঁদে পড়েছিলো বেশ কয়েক বছর আগে।'

ডোনাগান বললে, 'জানোয়ারটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ছিলো—দেখছো না, মাথার হাড়টা কী প্রকাণ্ড! চোয়াল আর দাঁতগুলোও কী-রকম বড়ো আর ছুঁচলো, লক্ষ্য করেছে?'

ক্রস ডোনাগানের মুখের পানে তাকিয়ে জিগেস করলে, 'তোমার কী মনে হয়, ডোনাগান? জন্তুটা মাংসভুক?'

'নিশ্চয়! আমিষখোর না-হ'লে কি আর দাঁতের গড়ন ও-রকম হয়?' তারপর বিজ্ঞের মতো গভীরভাবে সে যোগ করলে, 'জাগুয়ার কিংবা কাউগার হবে বোধকরি।'

'তবে তো ভয়ের কথা!' বললে বাস্কার।

সাবধান হ'য়ে চলতে হবে আর কী!' উদ্ভত গলায় বললে ডোনাগান, 'জানোয়ারের ভয়ে তো আর শিকার ছেড়ে গুহার মধ্যে ব'লে থাকলে চলবে না! অত তাদের জুজুর ভয়, তারা শিকারে না বেরলেই পারে!'

ফ্যান তখন তাদের সঙ্গে ছিলো। হঠাৎ সে বনের দিকে মুখ ক'রে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে শুরু ক'রে দিলে।

ওয়েব বললে, 'লক্ষণ তো ভালো দেখাছ না, ডোনাগান। ধারে-কাছে বোধহয় কোনো বুনো জানোয়ার এসেছে। দেখছো তো ফ্যানের রকমশকম! আজ আর বেশি খুঁকি নিয়ে কাজ নেই। চলো, বরং ফিরেই যাই গুহায়।'

এবার আর ডোনাগান কোনো চোটপাট করলে না। সাবধানে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে সবাই গুহার দিকে রওনা হ'লো। যাবার আগে কী মনে ক'রে উইলকক্স গর্তটিকে আবার আগের মতো ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখলে।

তারপর প্রায়ই তারা সেই গর্তের ডালপালা সরিয়ে দেখে আসতো গর্তের মধ্যে কোনো বুনো জানোয়ার পড়লো কি না। কিন্তু হা হতোশ্মি, গর্ত থাকতো যেমন কঁাকা তেমন কঁাকা—কোনোদিন কিছু পড়তো না। শেষকালে উইলকক্সের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। টোপ হিশেবে সে একদিন সেই ডালপালার উপর বড়ো এক টুকরো মাংস রেখে দিয়ে এলো।

ত্রিয়ঁ আর অন্য কয়েকজন বনের ভিতর দিয়ে কিছু দূরের একটা পাহাড় দেখতে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, যদি আরেকটা গুহার সম্ভান মেলে তো সেটাকে গুদোমঘর বানানো—কিছু-কিছু জিনিস লাহ'লে সেই গুহায় রেখে আমার বাসস্থা করা যাবে।

ফেরার পথে হঠাৎ বনের মধ্যে মস্ত কোলাহল শুনতে পেলো তারা। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে তারাও বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কাছে এসে দাঁথে সেই গর্তের চারধারে জড়ো হ'য়ে ছেলেরা ভীষণ হৈ-চৈ করছে, সকলেই খুব উত্তেজিত, সকলেই তড়বড় ক'রে হা-পা নেড়ে কথা কইছে। এমনকি ফ্যান হুঙ্কার তিড়িং তিড়িং ক'রে লাক দিচ্ছে আর ঘেউ-ঘেউ করছে, ল্যাজটা তার নিশানের মতো উপরে তোলা, আর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় টান-টান—গর্তের দিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছে সে বারে-বারে, কিন্তু সাহস ক'রে কিছুতেই আর ভিতরে ঢুকছে না।

ত্রিয়ঁ আরো কাছে এসে দেখলে গর্তের উপর তখনও ডালপালা ঢাকা রয়েছে, তবে কঁাক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরে একটা জানোয়ার পড়েছে। 'নিশ্চয়ই জাগুয়ার, নয়-তো কাউগার,' বলেছিলো ডোনাগান, 'আমিষখোর ভীষণ জন্তু কোনো কিছু।' কিন্তু ত্রিয়ঁ তখন ডালপালা একটু সরিয়ে হেঁট হ'য়ে জন্তুটাকে নিরীক্ষণ ক'রে হাসতে-হাসতে বললে, 'এ জাগুয়ারও নয়, কাউগারও নয়, গর্তের মধ্যে পড়েছে একটা উটপাখি।'

উটপাখির নাম শুনে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। ছোটোদের উৎসাহই সর্বাধিক। 'কী মজা! পাখিটাকে বেশ পোষ মানানো

যাবে !' আর শেষটায় যদি পোষ না মানে তখন মোকোর রান্নাঘরে চালান ক'রে দিলেই বেশ ভোজসভার আয়োজন করা যাবে ।

এতক্ষণ কেউই বুকে প'ড়ে জন্তটাকে দেখে নেবার সাহস পাচ্ছিলো না । কিন্তু এবার ডালপালা সব সরিয়ে ভালো ক'রে তারা পাখিটাকে দেখে নিলে । বেশ বড়ো পাখি, প্রকাণ্ড পিঠ, প্রকাণ্ড ডানা ; মাথাটা মুরগির মাথার মতো, সারা গায়ে বড়ো বড়ো শাদা পালক । পাখিটা কিন্তু আসলে ঠিক উটপাখি নয়, উটপাখি কেবল আফ্রিকাতেই দেখতে পাওয়া যায় । অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতের পাখিকে বলে এমু, আর দক্ষিণ আমেরিকায় এর নাম নান্ডু । পাখিটা সেই নান্ডু জাতের ।

'খুব সাবধানে থেকেো কিন্তু তোমরা,' বললে ত্রিয়'ী, 'এর একটা ঠোকর খেলে আর রক্ষে নেই—মাংস খুবলে নিয়ে যাবে একেবারে ! কিন্তু তবু এটাকে জ্যান্তই ধরতে হবে ।'

গর্তটা বেশ গভীর । পাখিটা এতক্ষণ কেবলই লাফিয়ে উঠে ডানা মেলবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু উঠতে পারছিলো না । এই বিশাল পাখিটাকে কী ক'রে জ্যান্ত ধরা যায়, এইটেই হ'লো সমস্যা ।

উইলকক্সের বুকে একেবারে ভয়ডর নেই । বেপরোয়াভাবে শেষটায় সে গর্তের মধ্যে নেমে পড়লো । অবশ্য পাখির ঠোঁটের দু-চারটে ঠোকর যে সে না খেলো তা নয় । কিন্তু পাখির আয়তনের তুলনায় গর্তটা ছোটো বলে পাখিটা বেশ কিছু করতে পারলো না । উইলকক্স গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে চক্ষের পলকে পাখিটার মাথা ঢেকে ফেললে । তারপর তিন-চারটে ক্রমাল নিয়ে পাখির ঠ্যাংছুটো আঁটো ক'রে বেঁধে ফেললে—গলাটাও বাদ গেলো না । পাখিটা এখন একেবারে অক্ষ ।

উইলকক্স যেমন ডাকাবুকো, সারভিস আবার তেমনি নাছোড়বান্দা । তাছাড়া সব সময়েই তার মাথায় আজগবি সব ফন্দি ঘুরছে । ফস্ ক'রে সে বললে, 'একে আমি পোষ মানাবো !'

'বনের উটপাখি কি পোষ মানবে ?' বললে ডোনাগান ।

'কেন মানবে না ?' তক্ষুনি সারভিস নজির তুলে ধরলে, 'আমি "সুইস ফ্যামিলি রবিনসন"-এ পড়েছি বুনো উটপাখি বেশ পোষ মানে । আমি বলছি, একে শুধু পোষ মানাবো না, এর পিঠের ওপর চড়বো !'

বই-পোকা সারভিসের কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না, কিন্তু তবু তার শাকেরদ জুটে গেল গারনেট । দু'জনে চটপট গুহা থেকে একগাছা বড়ো দড়ি

নিয়ে গেলো। সবাই মিলে পাখিটার পা দুটি আর গলা সেই দড়িতে বেঁধে তাকে উপরে টেনে তুললো। কী ভয়ানক জোর পাখিটার গায়ে! কেবল ডানা ঝাপটায়, লাফায় আর চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু যার পা আর গলা দড়িতে বাঁধা, আর মাথা কোট দিয়ে ঢাকা, সে আর শুধু গায়ের জোরে কী করতে পারবে? সকলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে গুহার মধ্যে নিয়ে এলো।

উইলকক্স আর সারভিস পাখিটার পা দুটো কাঁক ক'রে বেঁধে গুহার মধ্যে এক কোণে রেখে দিলে।

কিছুদিন পরে পোষা উটপাখির পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে যেতে পারবে শুনে কোমটার, ডোল আর ইভারসন তো মহা খুশি!

উপনিবেশ

এমনিতে গুহাটা মস্ত হ'লে কী হবে, এতজন লোকের পক্ষে সত্যি সেখানে থাকা খুব কষ্টকর। একটুতেই হাফ ধরে যায়। কেমন মনে হয় দম বন্ধ হ'য়ে আসবে। শেষকালে কয়েকদিন পরে একটা অধিবেশন ক'রে ছেলেরা ঠিক করলে, ফরাশি গুহার একটা দেয়াল খুঁড়ে ভিতরে আরেকটা ঘর ক'রে নেবে।

কাজটা অবিশি খুব কঠিন নয়, কারণ এদিকের দেয়াল চূনাপাথরে তৈরি, আর চূনাপাথর অত্যন্ত নরম। সামনের দীর্ঘ শীতকালে তারা শাবল আর গাইতি নিয়ে সেই দেয়াল খুঁড়ে অনায়াসেই আরেকটা ঘর তৈরি ক'রে নিতে পারে। কিন্তু খুব সাবধানে কাজ কবতে হবে, হুড়মুড় ক'রে কিছু করতে গেলেই উপর থেকে পাথর ধ'সে পড়তে পারে।

প্রথমে তারা জাহাজের একটা মজবুত দরজা এনে গুহার প্রবেশমুখে লাগালো। দুয়ারের দু-পাশের দেয়াল খুঁড়ে প্রস্তুত করলো দুটো বড়ো-বড়ো খুলঘুলি, যাতে গুহার দরজা বন্ধ ক'রে দিলেও ভিতরে বেশ আলো-হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ইতিমধ্যে এক-এক ক'রে পনেরো দিন কেটে গেছে গুহায় আসবার পর। হঠাৎ সেদিন, কথা নেই, বার্তা নেই, ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পেল ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। তুষারঝড়, তুষারবৃষ্টি। সত্যিকার শীতকাল শুরু হ'য়ে গেলো—যাকে বলে, কুমেরু অঞ্চলের কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত।

‘শীত যখন পড়লো, তখন বাইরে বেরুনোও বন্ধ—একেবারে নট নড়নচড়ন, নট কিছু। ইচ্ছে থাকলেও বাইরের কাজকর্ম করার কোনো উপায় নেই। ফলে গুহার ব’সে খামকা অকারণে সময় নষ্ট না ক’রে এবারে আমরা গুহার দেয়াল খুঁড়তে শুরু করলেই পারি,’ বললে ত্রিয়ঁ। ‘আমরা যদি গড়েন দিকের দেয়াল খুঁড়তে শুরু করি, তাহ’লে খুঁড়তে-খুঁড়তে শেষকালে হৃদের কাছে গিয়ে পড়বো, কারণ হৃদের দিকেই এখানকার গড়েন। তাতে আমাদের হৃদের দিকে আরেকটা দরজা হবে—এবং তাতে উপকারও হবে যথেষ্ট। কোনো কারণে যদি একদিকের পথ হঠাৎ বন্ধ হ’য়ে যায়, তাহ’লে অন্য দিক দিয়ে আমরা বাইরে বেরুতে পারবো।’

সুতরাং সেদিন থেকেই খননকর্ম শুরু হ’য়ে গেলো।

যে-কোনো কাজেই গোড়ার দিকে সকলেরই খুব উৎসাহ থাকে, তারপর হয়তো আশ্বে-আশ্বে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। প্রথমে তিন দিন কাজ খুব সুন্দর-ভাবে এগুলো তাদের। চূনাপাথর এত নরম যে তা যেন ছুরি দিয়েও কাটা যায়। তবে ভিতরে জায়গা বড়ো অল্প। সকলে একসঙ্গে কাজ করার কোনো সুবিধে নেই। তাই পালা ক’রেই কাজ করতে লাগলো তারা। তারপর সূড়ঙ্গটা যখন প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়েছে তখন একটা আশ্চর্য ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে গেলো। ভূতুড়ে কাণ্ড মানে, বুদ্ধিতে তার আর কোনো ব্যাখ্যা মিললো না।

কয়লাখনির ভিতরে লোকে যেমন ক’রে কয়লা কাটে, সেদিন বিকেলবেলায় ত্রিয়ঁও তেমনিভাবে চূনাপাথর কেটে চলছিলো। হঠাৎ তার মনে হ’লো—না, মনে হ’লো নয়, সে স্পষ্ট শুনতে পেলো—পাথরের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে! গাঁইতি খামিয়ে সে কান খাড়া ক’রে রইলো। না, মনের ভুল নয়। ওই তো, আবার সেই একই ধরনের শব্দ! ঠিক যেন কার চাপা কান্নার আওয়াজ।

ত্রিয়ঁ তক্ষুনি দেয়াল খোঁড়া বন্ধ ক’রে গরডনের কাছে গিয়ে সেই ভূতুড়ে আওয়াজের কথা জানালে। ব্যাপারটা শুনেই কেন যেন সকলের গা ছমছম ক’রে উঠলো। কাগজের মতো শাদা মুখে গরডন ব্যাপারটা উর্ডিয়ে দিলে, ‘ও কিছু না। কী শুনতে কী শুনেছো—তারও ঠিক নেই...’

ত্রিয়ঁ হাঁপাতে-হাঁপাতে চাপা গলায় বললে, ‘আমি কিছু ভুল শুনিনি। স্পষ্ট শুনতে পেলুম পাহাড়ের মধ্য থেকে শব্দ আসছে। এসো না, তুমিও একবার নিজের কানে শুনবে, এসো।’

গরডন জানতো ত্রিয়ঁ মিথ্যে ভয় দেখাবে না। তবু সে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিলো, কারণ ছেলেরা শুনতে পেলো বিষম ভয় পেয়ে যাবে।

কিন্তু ব্রিয়ার কথায় তাকেও এবার ভিতরে যেতে হ'লো। একটু পরে বেরিয়ে এসে ফ্যাকাশে মুখে বললে, 'তাই তো, ব্যাপারটা তো সত্যি! আমি কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ও-রকম ভীতুভাবে চাপা গলায় তাদের কথা বলতে দেখে দেখতে না দেখতে কৌতূহলী হ'য়ে ছেলেরা চারপাশে ভিড় ক'রে এসেছিলো। ডোনাগানের হাতে সখারীতি একটা বন্দুক ছিলো। পুরো ব্যাপারটা শুনে আর গরডনের ভয়-পাওয়া মুখের ভাব দেখে, তাচ্ছিল্যভরে সে বন্দুক নিয়ে বুক ফুলিয়ে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন ফিরে এলো তখন তার দশা এক ভীকু খরগোশের মতো। তারপর একে-একে বাস্‌টার, ক্রস, উইলকক্স আর সারভিসও গিয়ে শব্দটা শুনে এলো। সকলেরই মুখ ভয়ে তখন বিবর্ণ, সেই চাপা সর্জন সকলেরই কানে গেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কাজকর্ম বন্ধ রেখে সবাই দল বেঁধে খেতে এসে গেলো। সন্ধ্যা ভোজের পর আবার ভয়ে-ভয়ে সবাই তদন্ত করবার জন্য একজন একজন ক'রে সেই স্তূড়ের মধ্যে ঢুকে শব্দরহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না। আন্তে-আন্তে রাত ন-টা বেজে গেলো—সবাই একসঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। গলার স্বর নিস্তেজ, কী-রকম একটা ছমছমে ভাব সকলের মধ্যে। শব্দটা মোটেই তাদের মনের ভুল নয়, কারণ সে-সময়ে অনেকেই স্বকর্ণে শুনে এসেছে—অথচ, কী আশ্চর্য, এখন আর টু'-শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না। শেষটায় ব্রিয়ার সভাভঙ্গ ক'রে দিলো। বললো, 'যাও, যে-যার শুয়ে পড়ো গিয়ে। কাল আমরা তদন্ত ক'রে দেখবো। দিনের বেলায় ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে নিশ্চয়ই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই জল্পনা কল্পনা বন্ধ ক'রে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়লো। অনিচ্ছা এইজন্যে যে, সবাই এক জায়গায় ব'সে কথাবার্তা কইলে ভয় থাকে না, একা-একা বিছানায় শুয়েই কেমন যেন বুক তুকতুক করে। ভূত, না অন্য কিছু? ভূতুড়ে কাণ্ডই তো বটে, না-হ'লে পাথরের মধ্য থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ আসে কখনও? এমনকি ডোনাগান হুদু জুজুর ভয়ে বেশ কাবু হ'য়ে পড়েছিলো।

রাত তখন দুটো, হঠাৎ ফ্যানের গর্জনে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সবাই : সম্ভবত সেই ভূতুড়ে কাণ্ডের অভিজ্ঞতা সকলেরই বৃকের উপর কোনো বিষম অস্বস্তির মতো চেপে ব'সেছিলো, সেইজন্যেই একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে তারা জাখে, ফ্যান সেই ভীষণ

অন্ধকারে একবার ক'রে সড়কের মধ্যে ঢুকছে, আবার পরমুহূর্তেই রাগে ফুলতে-ফুলতে বেরিয়ে আসছে। ত্রিয়ার, গরডন আর ডোনাগান তখন আবার একে-একে সেই সড়কের মধ্যে প্রবেশ করলে। প্রবেশ করতেই শোনে সেই চাপা গর্জন, এখন সেই ক্ষুর আওয়াজ যেন আরো স্পষ্ট, আরো ভয়ংকর। সে-শব্দ যেন অনেক দূর থেকে আসছে, অথচ আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে পাহাড়ের ভিতর থেকে। 'কী ব্যাপার?' সবাই আতঙ্কিতভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। সত্যি কোনো স্তূতুড়ে ব্যাপার নয় তো? কোনো অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এই গুহার আশপাশে কাঁহনি গেয়ে ঘুরে বেড়ায় রাতে! ভাবনাটা তাদের মাথার মধ্যে এলেও মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ করলে না।

হঠাৎ ডোনাগান জিগেস করলে, 'আচ্ছা, এটা পাহাড়ের কোনো ঝরনার শব্দ নয় তো?'

'ঝরনার শব্দ ককখনো নয়,' বললে উইলকক্স, 'তাহ'লে মাঝে-মাঝে থেমে যাবে কেন?'

'ঠিক বলেছো,' বললে গরডন, 'আমার তো মনে হয় ওপরের কোনো ফাটলে হাওয়া ঢুকে ও-রকম বিদঘুটে আওয়াজ হচ্ছে।'

সে-কথা শুনে সবাই তখনকার মতো চূপ ক'রে গেলো বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে তারা ফ্যানের উত্তেজিত রকমশকমের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ হ'লে ফ্যান ও-রকম গব্বুর্ গব্বুর্ আওয়াজ ক'রে লাফকাঁপ দিতো না। বিশেষ ক'রে কুকুরদের স্পর্শাতুরতা তো অতি প্রবল, তারা অনেক অদ্ভুত জিনিশ টের পায়, এমন অনেক শব্দ তাদের কানে আসে বা এমন অনেক কিছু তারা দেখতে পায়, যা হয়তো মানুষের চক্ষুকর্মে ধরা পড়ে না। এ-সব প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করলো না, আবার গিয়ে যে যার শুয়ে পড়লো।

কোনো রকমে কাটলো সে-রাত্তিরটা। পরদিন ভোরবেলায় সবাই পাহাড়ে ওঠবার জন্যে গুহা থেকে বেরলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে সেই ফরাশি গুহার মাথার উপর গিয়ে উঠলো। কিন্তু চারদিকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা কোনো ফাটল দেখতে পেলো না। পাহাড়ের উপর নিবিড় ঝোপঝাড়, ভালো ক'রে খোঁজাও ছুঁকর। শেষে সবাই হতাশ হ'য়ে উপর থেকে নেমে এলো।

আবার সড়ক খোঁড়ার কাজ শুরু হ'লো। বেলা বারোটা পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নে কাজ চললো। কিন্তু বারোটার সময় আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। সেই সময় গর্ভ খুঁড়ছিলো বাস্কার। হঠাৎ তার মনে হ'লো, গর্তের দেয়াল যেন কী-রকম কাঁপা-কাঁপা মনে হচ্ছে। গাঁইতির শব্দ মনে হয় যেন ওদিকে পাহাড়ের

মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর আছে। বাস্ফটার তখন মহোৎসাহে নবোন্মত্তে গাঁইতি চালাতে লাগলো।

বেলা দুটোর সময় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ ক'রে সবাই যখন খেতে বসেছে, তখন হঠাৎ গরডনের খেয়াল হলো, গুহার মধ্যে ফ্যানের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্যান কোথায় গেলো? ফ্যান তো দিনরাত গুহার মধ্যেই থাকে, কেউ বাইরে না-গেলে সেও কখনও বেবোয় না। আর খাওয়ার সময় তো ফ্যানের নিয়ম হচ্ছে আগে থেকেই টেবিলের তলায় এসে বসা। এখন সে গেলো কোথায়? গরডন আর সারভিস দরজার কাছে গিয়ে ফ্যানের নাম ক'রে কত ডাকলো, আশেপাশে কত খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোনোখান থেকে তার কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

রাত যখন দুটো, সকলে তখন মন খারাপ ক'রে ঘুমোতে গেছে। ফ্যানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, গুহার ভিতরে বাতির চাপা কাঁপা-কাঁপা আলোয় ঘুমের আমেজ লেগে আছে, হঠাৎ একটা গভীর আর্তনাদ শুনে তাদের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। কে যেন অসহ যন্ত্রণায় থেকে-থেকে ককিয়ে উঠছে। একে গভীর খম্বধমে রান্তির, তায় আবার ঘুমের ঘোর; সকলের মনে হ'তে লাগলো এবার নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে কোনো দতি-দানা এসে ঢুকবে।

কার মুখে কোনো সাড়া নেই, কেবল সেই একটানা ভূতুড়ে ডুকরানির মধ্যে বিমূঢ় ও আতঙ্কিত মুখে সবাই গোল-গোল চোখে তাকিয়ে বসে ব্যাপারটা কী অনুধাবন ক'রে দেখার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ ব্রিয়ঁা টেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই শোনো, ঠিক সূড়ঙ্গের মধ্য থেকে কান্নার শব্দ আসছে!'

বলে, আর এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে সে সূড়ঙ্গের দিকে ছুটে গেলো। বাকি সবাই তখন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব ও আতঙ্কিত—আর একেবারে ছোটোরা ভয়ে কবলের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে। কেউ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন তাদের কী করা উচিত।

ব্রিয়ঁা ফিরে এলো একটু পরেই। এসে বললে, 'কান্নাটা আসছে, মনে হয়, ওদিককার গহ্বর থেকে। নিশ্চয়ই হৃদের দিকে গহ্বরের মধ্যে ঢোকান কোনো রাস্তা আছে—সেখান দিয়ে বুনো জানোয়ারেরা এসে গহ্বরের মধ্যে আস্তানা পেতেছে।'

হয়তো ব্রিয়ঁার অনুমানই ঠিক। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা হ'লো না। এই নিশ্চিন্তি রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বেরিয়ে অনুসন্ধান করার ইচ্ছেও কার তেমন দেখা গেলো না। সবাই আবার কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়লো। কাল দিনের বেলায় যা-হোক কিছু একটা ভেবে বার করা যাবে।

পরদিন সকালবেলায় কিন্তু তাদের ভীতু ভাবটা কেটে গেলো। রাতের ভুভুড়ে কান্না শব্দে কোনো কথাবার্তাই হ'লো না—ব্যাপারটা নিয়ে দিনের বেলায় হই-চই করতে কেমন যেন লজ্জা হ'লো। কত কারণেই তো ও-রকম আওয়াজ হ'তে পারে, তা নিয়ে মিথ্যে অমন ঘাবড়ে ঘাবার কী আছে ?

আবার দেয়াল খোঁড়া চললো। দুপুরের পর দেয়ালটাকে তাদের খুবই কাঁপা ঠেকতে লাগলো—মনে হ'লো আর ইঞ্চি দু-এক খুঁড়লেই ওদিককার গহ্বরের দেখা পাওয়া যাবে। গহ্বরের মধ্যে না-জানি কোন আশিষখোর বুনো জানোয়ার লুকিয়ে আছে—গুহার সঙ্গে যোগাযোগ হ'লেই এসে হয়তো ছেলেদের আক্রমণ করবে। তাই ডানাগান, ক্রম, ওয়েব আর উইলকল্ল—চারজনে চারটি বন্দুক বাগিয়ে ধরে তৈরি হ'য়ে গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

তখনো দেয়াল খুঁড়ছিলো ব্রিয়ঁ। হঠাৎ শাবলের একটা চাড় দিয়েই সে টেঁচিয়ে উঠলো। আর শাবলের ঘায়ে যেমন দেয়াল থেকে একটা প্রকাণ্ড চাঙড় ভেঙে পড়েছে, হাতের শাবলটাও সঙ্গে সঙ্গে হাত ফশকে ওদিককার গহ্বরের মধ্যে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে। ব্রিয়ঁ তখন খালি হাতে তাড়াতাড়ি গুহার মধ্যে পেঁছিয়ে এলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই ভাঙা ফাটলের মধ্য থেকে একটা জন্তু একলাফে গুহার মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়েও ডোনাগানরা হঠাৎ পেমে গেলো। জন্তুটা আর-কেউ নয়, তাদেরই বড়ো আদরের ফ্যান। ফ্যান গুহার তুকেই কারু দিকে না-তাকিয়ে প্রথমে ছুটে গেলো মেঝেয় বসানো একটা জলভরা পাত্রের দিকে। জলে মুখ ডুবিয়ে প্রথমে চকচক ক'রে সে পেট পুরে প্রচুর জল খেয়ে নিলে, তারপর ল্যাঙ্গ ছলিয়ে ফিরে এলো ছেলেদের কাছে। এসে ঘন-ঘন ল্যাঙ্গ নাড়তে লাগলো, মুখ তুলে বার-বার তাদের দিকে তাকাতে লাগলো—মুখে এখন তার এতটুকু রাগের চিহ্ন নেই।

এইবারে গহ্বরের পরীক্ষার পালা। ভয়ে সকলেরই বুক দুর্দুর্দ করছে, কিন্তু তবু সাহস ক'রে একে-একে সবাই সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গিয়ে নামলো। ফ্যান যখন সারা রাত ওই গহ্বরের মধ্যে কাটাতে পেরেছে, অথচ গায়ে তার এতটুকু আঁচড় লাগেনি, তখন এত ভয় পাবার আর কী আছে—এই তারা ভাবলে।

প্রকাণ্ড গহ্বর। চওড়ায় ফরাশি গুহার মতো, কিন্তু লম্বায় তার ডবল ; শক্ত অ্যাড্রিট পাথরের মেঝে। অন্ধকার গহ্বর দেখে ওরা ভেবেছিলো ভিতরের

বাতাস হয়তো বা বিষাক্ত। কিন্তু দেখা গেলো হাতের লঠন দিবিয়া জ্বলছে। নিশ্চয়ই কোনো ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে খোলা হাওয়া আসে। আর তা যদি না-ই থাকবে তো ফ্যানই বা তার ভিতরে গিয়েছিলো কেমন করে? আলো হাতে তারা চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলো। এত বড়ো গুহার হাতের একটা লঠনে কতটুকুই বা আলো হয়? অনেকটাই আছে অন্ধকারে ঢাকা।

হঠাৎ কিসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে উইলকক্স গুহাবের কাঁধ ঝাঁকড়ে ধ'বে বেঁচে গেলো। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে নিচে হাত দিয়ে ছাথে একটা ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ রোমশ দেহ প'ড়ে আছে মেঝেয়। উইলকক্স ভয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

উইলকক্সের আর্তনাদ শুনে ব্রিয়ঁ তাড়াতাড়ি লঠন নিয়ে এসে ছাথে মৃত-দেহটি অণু-কিছুর নয়, একটা প্রকাণ্ড শেয়ালের। ব্রিয়ঁ বললে, 'এ নিশ্চয়ই আমাদের ফ্যানের কাঁধ!'

'এখন বোঝা গেলো,' বললে গরডন, 'এই দু-দিন আমরা কোনো ভূভূড়ে কান্না শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।'

কিন্তু এরা ভেবে পেল না এই গহ্বরের মধ্যে শেয়াল-কুকুর দুটি ঢুকেছিলো কী করে? প্রবেশপথ তো দূরের কথা, কোথাও আলো-হাওয়া আসার একটা ছোট্ট ফোকর অবধি দেখা যাচ্ছে না। ফ্যান তখন তাদেরই সঙ্গে পায়ের-পায়ের ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সারভিস তাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'ফ্যান, বল্ দিকিন, তুই কী ক'রে ভিতরে ঢুকেছিলি? আমরা যে খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে উঠলুম!'

নিজের নামটা শুনে ফ্যান ছোট্ট দুটি ষেউ-ষেউ ক'রে ধন-ধন লাজ নাড়তে-নাড়তে মাথা জুলিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ ক'রলো। সে যে তাদের সব তদন্তের সমাধান ক'রে দেবে, এমন-কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

ব্রিয়ঁর মাথাটি ভারি উর্ধর। এরই মধ্যে তার মাথায় একটি ফন্দি গজিয়েছে। সকলকে সেই নতুন গহ্বরের মধ্যে থাকতে ব'লে সে ফরাশি গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হ্রদের তীরের সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে চললো। সে চীৎকার ক'রে সকলের নাম ধ'রে ডাকে, ছেলেরাও ভেতর থেকে চীৎকার ক'রে উত্তর দেয়।

এই ভাবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবেশপথটা আবিষ্কার করা গেলো। পাহাড়ের কোলে একটা নিবিড় ঝোপের মধ্যে একেবারে মাটি বরাবর একটা গর্ত :সেই গর্ত দিয়েই শেয়াল আর কুকুর গহ্বরের মধ্যে ঢুকেছিলো। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ফ্যান কেন আর বেরিয়ে আসতে পারছিলো না? এই প্রশ্নেরও উত্তর সহজেই পাওয়া

গেলো। ফ্যান ভিতরে ঢোকবার পরে কোনোরকমে একটা আলগা পাথর ধ'সে পড়ে গছের প্রবেশপথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো—তাই ফ্যান ওই গছেরই বন্দী হ'য়ে পড়েছিলো—আর বেরতে পারছিলো না।

দ্বিতীয় গছেরটার নাম রাখা হ'লো হলধর। এবার থেকে হলধরেই সকলের শোবার ব্যবস্থা হবে, ফরাশি গুহাটা হবে তাঁড়ার ঘর আর রন্ধনশালা। সব আশবাবপত্তর এবার হলধরে নিয়ে আসা হ'লো। হ্রদের দিকের প্রবেশপথে বসানো হ'লো একটা দরজা, আর দরজার দু-দিকে দুটি ঘুলঘুলি বানিয়ে আলো-হাওয়ার ব্যবস্থাও করা হ'লো। দুই গুহার মাঝখানের গলিটার দু-পাশে তারা দুটি চোরাকুঠুরিও তৈরি করলে—সেখানে তালি বন্ধ ক'রে রাখা হ'লো সব অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক ও গুলিবাক্স।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় গোল হ'য়ে ব'সে তারা নানারকম গল্প করছে, হঠাৎ গরডন বললে, 'এই দ্বীপেই যখন আমাদের চিরদিন বাস করতে হবে—অস্ত্র-যতদিন না কোনো জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে ততদিন তো বটেই—তখন দ্বীপের বিভিন্ন অংশের একেকটা নাম দেয়া দরকার। অনেকগুলো নাম চাই। যে-উপসাগরে আমাদের জাহাজ ভেসে এসে ভিড়েছিলো, প্রথমেই চাই তার একটা নাম। তারপর নদীর একটা নাম চাই। হ্রদের, ওই পাহাড়টার, জলাভূমির, ওদিককার অস্তরীপের—সবকিছুর জন্মেই নাম ঠিক করতে হবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সারভিন বললে, 'গরডন ঠিক বলেছে। আমরা যে একেকজন খুদে রবিনসন ক্রুসো, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং দ্বীপের প্রত্যেকটা অংশের নামকরণ করতে হবে আমাদের।'

ডোনাগান বললে, 'আমাদের জাহাজটা স্কুনার জাতীয় ছিলো, সুতরাং উপসাগরের নাম হোক স্কুনার উপসাগর।'

'বেশ ভালো নাম,' বললে ক্রস, 'কিন্তু উপসাগরের মধ্যে যে-নদীটা গিয়ে পড়েছে, তার নাম কী হবে?'

'কেন, জীল্যাও রিভার,' বললে বাব্বটার, 'নামটা আমাদের দেশের কথা মনে পড়িয়ে দেবে।'

গারনেট বললে, 'তবে হ্রদের নাম কী হবে?'

'দেশের স্মৃতিতে যেমন নদীর নাম করা হ'লো,' বললে ডোনাগান, 'তেমনি আমাদের আত্মীয়স্বজনের স্মরণে হ্রদের নাম হোক ফ্যামিলি লেক।'

এইভাবে পাহাড়টার নাম রাখা হ'লো অকল্যাও হিল, অস্তরীপটার নাম ঠিক হ'লো ফল্‌স পয়েন্ট। বনের যেখানে কাঁদ দেখা গিয়েছিলো সেখানটার

নাম হ'লো ট্র্যাপ উড্‌স্‌। কুনার বে আর অকল্যাণ্ড হিলের মধ্যকার নাম রাখা হ'লো বসউড। জলাভূমিটা দ্বীপের গোটা দক্ষিণ দিক জুড়ে ব'লে তার নামকরণ হ'লো সাউথ মুর। ঝরনাটার নাম রাখা হ'লো ডাইক ক্রীক। দ্বীপের ঘে তীরে এসে জাহাজ ভিড়েছিলো, তার নাম হ'লো রেক কোস্ট। হ্রদের আর নদীর তীরের মধ্যবর্তী জায়গাটার নাম হ'লো গেম ফরেস্ট, কারণ সেখানেই ছেলেদের খেলাধুলো করতে সুবিধে হবে। বদোয়ার ম্যাপ থেকে জানা গিয়েছিলো দ্বীপের উত্তরে আর দক্ষিণে আরো দুটো অস্তুরীপ আছে, পশ্চিমেও আরেকটা। ওই তিনটে অস্তুরীপের নাম রাখা হ'লো ব্রিটিশ কেপ, আমেরিকান কেপ আর ফ্রেন্স কেপ।

এইভাবে দ্বীপের নানা অংশের একেকটা নাম ঠিক করা হ'লে পর ত্রিয়ঁা বললে, 'তোমরা এত জিনিসের নাম দিলে, কিন্তু আসল জিনিসেরই কোনো নাম দিলে না! এই দ্বীপের একটা নাম হওয়া উচিত নয় কি?'

অমনি সারভিস বললে, 'এর নাম হোক বেবি আইল্যান্ড—আমরা এতগুলি ছেলে যখন এই দ্বীপের উপর এসে উঠেছি।'

তখন কোসটার বললে, 'কিন্তু আমরা সবাই যখন চারম্যান স্কুল থেকে এসেছি তখন দ্বীপের নাম হওয়া উচিত চারম্যান আইল্যান্ড।'

সবাই উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'বেশ নাম, খাশা নাম! বেশ একটা ভৌগোলিক গন্ধও আছে।'

কোসটার মুখটা গম্ভীর আর ভারি ক্লি করার চেষ্টা করলে। নেহাত যে-সে ছেলে তো আর সে নয়—তার মাথা থেকেই তো দ্বীপের অমন সুন্দর নামটা বেরিয়েছে!

এত সব নাম দিতে-দিতে রাত অনেক হ'য়ে গিয়েছিলো—কারু-কারু বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। দু-চারজন তো বেঞ্চি থেকে উঠেও দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু এমন সময় ত্রিয়ঁা এমন একটা কথা বললে যে সকলেই বেশ উত্তেজিত ও আনন্দিত-ভাবে আবার জমিয়ে ব'সে পড়লো, কেবল ডোনাগান ছাড়া—তার মুখটা কেন যেন শুকিয়ে একেবারে আশি হ'য়ে গেলো।

ত্রিয়ঁা বললে, 'দ্বীপের নামকরণ তো হ'লো, কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর একটা কাজ আমাদের বাকি আছে। আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটার ওপর শাসন করার জন্য আমাদের একজন নেতা দরকার। তাতে আমাদের সুবিধে অনেক। কারণ সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল কিছুতেই হবে না, মনোমালিন্ত দেখা দেবেই। তাই একজন দলপতির দরকার, যার কথা সকলকে মাথা

পেতে নিতে হবে। এখন কে সেই দলপতি হবে, তা তোমরাই ঠিক ক'রে নাও।'

ডোনাগানের বুক ছুঁছুঁ করতে থাকলো। এতদিন সে বেশ স্বাধীনভাবে খেয়াল-খুশিমতো চলাফেরা করেছিলো, কিন্তু ত্রিয়ঁ। এখন আবার এ কী ফ্যাসাদ বাধালো! কিন্তু ত্রিয়ঁ।র কথা শুনে সকলেই তখন সম্মুখে মহোৎসাহে ব'লে উঠেছে, 'ঠিক কথা! একজন দলপতি আমাদের চাই।'

ডোনাগানের ভারি ইচ্ছে সে নিজেই নেতা হয়। কিন্তু সেদিকে আশা খুব কম, কারণ ত্রিয়ঁ।র দলে ভারি। কিন্তু ডোনাগানের উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। চট ক'রে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ, দলপতি একজন হোক, কিন্তু তার শাসনের সময় নির্দিষ্ট থাকা দরকার। ধরো, এখন এক বছরের জন্যে কেউ নেতা নির্বাচিত হ'লো, পরে এক বছর পরে আবার আরেকজন হবে আরেক বছরের জন্যে।'

ত্রিয়ঁ। কিন্তু ডোনাগানের মতলব বুঝতে পেরেছিলো। তাই সে বললো, 'ডোনাগানের কথা খুবই ঠিক, কিন্তু এক বছর পরেও আগের দলপতি আবার নির্বাচিত হ'তে পারবে—সে-বিষয়ে কোনো বাধা থাকবে না।'

এরপর আর ডোনাগানের কিছুই বলার রইলো না। ত্রিয়ঁ।ও মতামত নিয়ে আর বেশি সময় নষ্ট করলে না। বললে, 'এবারে দলপতি নির্বাচিত হোক। আমার মতে গরডনকে দলপতি করাই সবচেয়ে ভালো। এতে তোমাদের কারু কোনো আপত্তি আছে?'

সবাই একসঙ্গে চোঁচিয়ে উঠলো, 'মোটাই না! মোটেই না!'

'তাই'লে আজ থেকে এক বছরের জন্যে গরডন আমাদের নেতা ও এই চারম্যান আইল্যাণ্ডের শাসনকর্তা নির্বাচিত হ'লো। এবার থি, চিয়র্স ফর গরডন!'

'হিপ-হিপ-হিপ্ ছরে' ধ্বনির মধ্যেই চারম্যান আইল্যাণ্ডের উপনিবেশের প্রথম নেতা গরডনের সম্মানে পরদিন ছুপুর্বে মোকো এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করবে ব'লে জানিয়ে দিলে।

ছেলেরা হই-চই করতে-করতে যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

চিয়ার্স ফর বাস্কেটবল

গরুড়নের সুশাসনে শীতকালটা বেশ ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলো। ছেলেরা ধ'রেই নিয়েছে যে এই ছীপেই তাদের দিন কাটাতে হবে—কাজেই যাতে দিনগুলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে না-কাটে, যাতে আনন্দে আর স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়, সেইজন্মে কেউই কাজকর্মে কোনো গাফিলতি করে না। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ব'লেই বেশ মস্তুষ্ট আছে।

২৬শে অক্টোবর ছীপে বেশ একটা মজার কাণ্ড হ'য়ে গেলো। সারভিস আগের দিন ব'লে রেখেছিলো আজ সে উটপাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে বসবে, তাই সকালবেলাতেই তার কাণ্ড দেখতে ছেলেরা কোলাহল ক'রে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রথমে সারভিস অনেক কসরত ক'রে, অনেক কষ্টে, পাখিটার পিছনে গিয়ে তার গলায় একটা লাগাম আর মাথায় একটা ঢাকনি পরিয়ে দিলে। এগুলো সে অনেক পরিশ্রম ক'রে নিজেই তৈরি করেছিলো। গরুড়ন অবশ্য প্রথমটায় অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু খুদে রবিনসন ক্রুসো এই সারভিস একেবারে নাছোড়বান্দা। লাগাম পরাবার পরে সারভিস পাখিটার পায়ের দড়ি ধ'রে টেনে গুহার বাইরে নিয়ে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল করতে-করতে অন্ত ছেলেরাও চললো। না-জানি উটপাখির পিঠে চড়তে কী মজা! সারভিস যদি প্রথমে চ'ড়তে পারে, তাহ'লে তারাও এক-আধবার চেষ্টা ক'রে দেখবে। বাইরে নিয়ে এসে বাস্কেটবল আর গারনেট পাখিটাকে মজোর চেপে ধ'রে রইলো, আর সারভিস হেঁট হয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে দিলে।

এবারে পাখিটা সম্পূর্ণ মুক্ত। সামনেই আবার নিবিড় বন। কাজেই বাস্কেটবল আর গারনেট পাখিটার দু-পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রাণপণে চেপে ধ'রে রইলো, যাতে পাখিটা কিছুতেই পালাতে না পারে। এই ফাঁকে সারভিস অনেক কসরত ক'রে পাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে ব'সে লাগাম টেনে ধরলে। গারনেট আর বাস্কেটবলকে ছেড়ে দিতে বলতেই তারা ছেড়ে দেবে, কিন্তু 'ছেড়ে দাও' কথাটি আর সারভিসের মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোতে চায় না। কেমন যেন ভয় করছে। কী জানি, যদি পালাতে গিয়ে পাখিটা কোনো বিষম কাণ্ড ক'রে বসে। শেষটার অনেক কষ্টে বুকে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে সারভিস বললে, 'এইবার ছেড়ে দাও।'

অমনি বাস্কেটার আর গারনেট পাখিটাকে ছেড়ে দিলে ।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ছাড়া পেয়েও পাখিটা নড়ে না কেন ? বোধহয় পাখির চোখটুকি বন্ধ বলেই পাখিটা নড়ছে না, এই ভেবে সারভিস হাতের ছড়ি দিয়ে তার মাথার ঢাকনিটা খুলে দিলে । যেই না ঢাকনি খোলা, অমনি পাখিটা হু-পাখা ছড়িয়ে একেবারে তীরের মতো বনের দিকে ছুটে চললো । সারভিস বেশ ভয় পেয়ে প্রায় তার পিঠের উপর শুয়ে হু-পায়ে তাকে আঁকড়ে ধরে হু-হাতে লাগাম চেপে থাকলো ! পাখি তখন উড়ার মতো ধাবমান । পিছনে চীৎকার করতে-করতে ছেলেরা ছুটে আসছে । সারভিসকে নিয়ে এই সর্বনেশে রাক্ষুসে পাখি কোথায় চলেছে !

সকলেরই ভয় হ'তে থাকলো : সারভিসকে বুঝি তারা চিরকালের মতো হারালো ? পাখিটা যে ক্রমেই চোখের আঁড়ালে চ'লে যাচ্ছে ! হঠাৎ তারা দেখতে পেলো সারভিস কেমন ক'রে যেন পাখির পিঠ থেকে আচমকা মাটির উপর ছিটকে পড়লো, আর পাখিটা পরমুহূর্তেই লাগাম-সম্মত দূর বনের আঁড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা সারভিসের কাছে এসে পড়লো । বেচারি তখনও মাটি থেকে উঠতে পারছে না । পাখির পিঠ থেকে প'ড়ে গিয়ে হয়তো তার কোমরটাই ভেঙে গেছে ! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে টেনে তুললো । দেখা গেলো তেমন-কিছু গুরুতর আঘাত তার লাগেনি ।

কোনোমতে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে সারভিস বললে, 'হায়-হায় ! আমার অমন সুন্দর পাখিটা চ'লে গেলো !.....নছার, অকৃতজ্ঞ কোথাকার !'

ডোনাগান হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি যে প্রাণে বেঁচেছো, এইজন্মই তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত । পাখির কথা আর মুখেও এনো না !'

সারভিস তখন বনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরে হতছাড়া বেইমান পাখি, তোকে অ্যান্ধিন ধ'রে খাওয়ালুম, এত সেবা করলুম, আর তুই কিনা তার এমন প্রতিদান দিয়ে গেলি !'

উটপাখির অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সহাস্ত আলোচনা করতে-করতে সবাই ফরাশি গুহায় ফিরে এলো ।

এদিকে নভেম্বর মাস আসন্ন । এতদিন তো শীতের ভয়ে সবাই কাবু হ'য়ে ছিলো—গুহা থেকে বিশেষ বেরনো যায়নি । কিন্তু এবার দীপটাকে একটু ভালো ক'রে দেখা দরকার । গোটা চারম্যান আইল্যাণ্ডের কোথায় কী আছে,

সেটা তাদের নখদর্পণে ধাকা উচিত। সময় নষ্ট না ক'রে ছেলেরা তখনই অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

নভেম্বরের পাঁচ তারিখে গরডন, ডোনাগান, বাস্‌টার, ওয়েব, ক্রস আর সারভিস—এই ছ-জন কুকুর ফ্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরলো। জিনিশ-পত্রের মধ্যে গরডন, ডোনাগান আর বাস্‌টার এই তিনজনে নিলে তিনটে বন্দুক আর তিনটে পিস্তল। দলের অন্য সবাই নিলে একটা ক'রে বড়ো ছোরা। তাছাড়া নিলে ছটো কুড়ুল, একগাছা ল্যামো, একগাছা বোলা আর একটা স্টকেসের মধ্যে সেই রবাবের নৌকোটা। ভারি সুন্দর এই নৌকো, ওজনে বড়ো-জোর পাঁচ-ছ সের। ব্যাগের মধ্যে তা ভাঁজ ক'রে নেয়া যায়, আবার তাইতে ক'রে নদী পার হওয়াও যায়। গরডন আবার ফ্রান্সোয়া বদোয়ার ম্যাপের একটা নকলও সঙ্গে নিলে।

কয়েক দিন ধ'রে একটানা হাঁটতে-হাঁটতে তারা অবশেষে সেই হ্রদের সীমানায় এসে পৌঁছোলো। এ-কদিন তারা বুনো খরগোস আর জংলি পাখির মাংস খেয়ে কাটিয়েছে। কখনও বা তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছে খোলা আকাশের তলায়, নতুন-নতুন দৃশ্যও দেখেছে অনেক। ডোনাগানের ইচ্ছে ছিলো ফ্যামিলি লেকের ওপারটাও দেখে আসে। কিন্তু গরডন বললে, 'না, এবার ফিরতে হবে।' নেতার আদেশ, তাই ডোনাগান আর-কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে তার কথাই মেনে নিলো।

ফেরার পথে এক জায়গায় তারা দেখলে মস্ত একটা গাছ—প্রায় আশি ফুট উঁচু। আর কী প্রকাণ্ড তার শাখা-প্রশাখা! এর পাশেই তারা আবার আবিষ্কার করলে চা-বাগান। সঙ্গে নমুনা হিশেবে কয়েকটা গাছ তারা তুলে নিলে। পরে স্তব্ধ-মতো এসে আরো পাতা তুলে নিয়ে গেলেই চলবে।

চা-বাগান পেরিয়ে চ'লে আসছে, এমন সময় হঠাৎ গরডন থেমে গিয়ে বাস্‌টারের হাত ধরে ফিশফিশ করে বললে, 'বাস্‌টার, ওই গাছো, পাহাড়ের কোলে মাঠের উপর ছাগলের মতো কী সব জন্তু চরে বেড়াচ্ছে!'

বাস্‌টার তাকিয়ে বললে, 'ছাগল হবে কি? না কি অন্য কোনো জানোয়ার?'

গরডনও ভালো করে তাকিয়ে বললে, 'না ঠিক ছাগল নয়—তবে ছাগল-জাতীয় কোনো জন্তু নিশ্চয়ই। যাই হোক, এদের একটাকে তুমি কি পাকড়াতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?' বাস্‌টার কেবল ছোট্ট ক'রে বললে।

বনের আড়ালে কিছু দূরে একটা বিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠেই ছ-সাতটা ছাগল-জাতীয় জন্তু চ'রে বেড়াচ্ছিলো। তখনও পর্যন্ত তারা ছেলেদের দেখতে পায়নি, কাজেই বেশ নির্ভাবনাতেই তারা ঘাস খাচ্ছিলো। গরডন আর বাক্সটার অতি সাবধানে পা টিপে-টিপে তাদের দিকে এগুতে লাগলো। কোনো সাড়া-শব্দ কিছু নেই, হঠাৎ দেখা গেলো সবচেয়ে বড়ো ছাগলটা শূন্যে মুখ তুলে নাক দিয়ে কাঁ যেন শুঁকবার চেষ্টা করছে। পরমুহুর্তে সেটা পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাবার উপক্রম করলো, আর তার দেখাদেখি বাকিগুলোও। তখন বাক্সটার চোখের নিমেষে তাদের সামনে ছুটে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে সেই সুদীর্ঘ বোলা একটার উপর ছুঁড়ে মারলে। অদ্ভুত তার হাতের টিপ, আর অব্যর্থ সেই বোলার নাগপাশ! কিছুতেই তাগ ফসকালো না, বোলাটা চোখের পলকে একটি ধাবমান ছাগলের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ফেললো। বাকি ক-টা সন্ধে-সন্ধে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো—আর একটু দৌঁড় হ'লেই এটানেও আটকানো যেতো কি না সন্দেহ।

গরডন আর বাক্সটার তখন দৌঁড়ে সেই ছাগলটার কাছে গিয়ে ছাখে, সেটা মাটির উপর পড়ে বোলার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্তে বুথাই চেষ্টা ক'রে চলেছে। তার দুটি বাচ্চাও মায়ের এই দুর্দশা দেখে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। গরডন তাড়তাড়ি সেই হতভম্ব বাচ্চাটিকে ধ'রে ফেললে, ওয়েব তাদের ধ'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে।

‘এগুলো কি সত্যিই ছাগল?’ গরডনকে জিগেস করলে বাক্সটার, ‘কাঁ অদ্ভুত গড়ন এদের!’

গরডন বললে, ‘না, এদের বলে ভিক্যুনা, শাদা কথায় অবিশ্বি এক ধরনের পাহাড়ি ছাগলই বলা চলে। এরা খুব দুধ দেয়।’

ভিক্যুনাগুলো দেখতে সত্যিই অদ্ভুত। ছাগলের মতো চেহারা হলেও তাদের পায়ের খুরগুলো ভয়ানক লম্বা, গায়ের লোম রেশমের মতো, মাথাটা দেহের তুলনায় নিতান্তই ছোটো, শিঙের কোনোই বালাই নেই।

পরদিন আবার আরেক ব্যাপার। ডোনাগান, ক্রস আর ওয়েব ফ্যানকে নিয়ে আগে-আগে চলেছে, পিছনে-পিছনে আসছে গরডনরা—ছ-দলের মধ্যে প্রায় একশো গজের ব্যবধান। গাছপালা এখানে খুবই ঘন, তাই এক দল অল্প দলকে দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ পিছনের ছেলেরা অতর্কিতে সামনে কিসের কোলাহল শুনে চমকে উঠলো। কাঁ ব্যাপার বুঝতে না পেরে কিঞ্চিৎ ভয়ই পেল তারা। সামনের দলটির কোনো বিশদ-আপদ হ'লো না তো? তাড়তাড়ি

তার। সারনের দিকে ছুটলো। কিন্তু বেশি দূর তাদের যেতে হ'লো না—প্রায় পর-ক্ষণেই দেখতে পেল, আগাছা জঙ্গল সরিয়ে কী একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার হুড়মুড় ক'রে তাদের দিকে ছুটে আসছে। একটু কাছে আসতেই ঝাখে, ঘোড়ার মতো একটা প্রকাণ্ড জন্তু। দেখেই বাস্কাটার আর ইতস্তত করল না, শুকুনি তার বোলা ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না! ব্যাটাকে জ্যান্ট ধরবো।'

ওদিকে ডোনাগানও ছুটে আসতে-আসতে বলতে লাগলো, 'আমার গুলিটা বড়ো-জোর ফশকে গেছে! ক্রস, আর দেরি করছ কেন? গুলি করো, চালাও...'

'খবরদার কেউ গুলি চালাও না,' হাত নেড়ে বারণ করল গরডন, 'এটা আমাদের মাল-বওয়া কুলি হবে!'

বাস্কাটারের বোলার নাগপাশে বন্দী হ'য়ে সেই অভুত জন্তুটা তখন মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়েছে। চার পা ছুঁড়ে সে কী অসহায় আর্ত স্বরে নালিশ জানাচ্ছে! সকলে তফাতে দাঁড়িয়ে জন্তুটাকে দেখতে লাগলো।

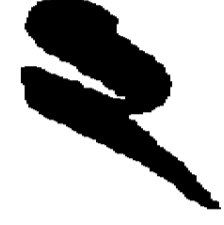
সারভিস জিগেস করলে, 'এ আবার কী জন্তু, গরডন? খানিকটা ঘোড়ার মতো দেখতে, আবার খানিকটা উটের মতো? এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো "রবিনসন ক্রুসো" বা "স্বাইস ফ্যামিলি"-তে নেই!'

গরডন বললে, 'এ নিশ্চয়ই গুঅনাকো। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম এলাকায় এদের পাওয়া যায়।'

গুঅনাকো অনেকটা উটের মতো দেখতে হলেও আসলে এক ধরনের ঘোড়াই। গায়ের রঙ আবার চিতল হরিণের মতো। বড়ো শাস্ত আর নিরীহ হয় এরা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তার পা ছোঁড়া শেষ হ'লো। এখন যেন করুণ চোখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সাহায্য চাচ্ছে। তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেলো, এ সহজেই পোষ মানবে। তখন তাকে দিয়ে মাল বওয়ানো তো যাবেই, তার পিঠেও চড়া যাবে। বাস্কাটার তার গলায় ল্যাসোর কান পরিয়ে দিয়ে আন্তে-আন্তে বোলার পাশ খুলে দিলে। কী আশ্চর্য! ছাড়া পেয়েও গুঅনাকোটা একটুও পালাবার চেষ্টা করলে না।

আর দেরি না করে সবাই ফরাশি গুহার দিকে ফিরে চললো। অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। চা-বাগান আবিষ্কার করা গেছে, ছুটো বাচ্চা-সমেত ভিকুনা আর সর্বোপরি একটা নিরীহ অথচ শক্তিশালী গুঅনাকো ধরা গেছে। ডোনাগানের বন্ধুকের চেয়ে আদির যুগের ল্যাসো আর বোলা যে

অনেক সময়ই বেশি কাজে আসে, এ-কথা সবাই—এমনকি ডোনাগান স্বয়ং—
স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো। অবশ্য বাস্‌টারের কৃতিত্বও কম নয়। কী রকম
গুস্তাদের মতো এ-সব আদিম নাগপাশগুলো সে ব্যবহার করতে শিখেছে—
কী ক্ষিপ্ত আর কী তাগ! কিছুতেই তার লক্ষ্য ফসকার না। বন্ধুরা সবাই এক-
সঙ্গে বাস্‌টারকে শাবাশ দিয়ে চেষ্টা করে উঠলো, 'চিয়ান' ফর বাস্‌টার, হব্বরে !'



ঈপের রহস্য

সীল শিকার

ফরাশি গুহায় এই ক-দিন সকলেই বেশ ভালো ছিলো, কিন্তু জাকের হাবভাব ত্রিয়ঁকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুললে। সেই প্রাণখোলা হাশিখুশি হৈ-চৈ-করা জাকের মনে এ কী বিপর্যয় এলো! সারাক্ষণ কালো মুখ ক'রে ব'সে থাকে, কী যেন ভাবে সব সময়; মুখে সেই দীপ্তি নেই, কথাম-বার্তায় নেই ফুঁতির লেশ-টুকুও। একদিন জাককে আড়ালে ডেকে এনে ত্রিয়ঁ খোলাখুলি জিগেস করলে, 'জাক, তোর কী হয়েছে খুলে বল, আমার কাছে লুকোসনি।'।

শুকনো হেসে জাক বললে, 'কী আবার হবে? কিছু না।'।

'উঁহ, তা হ'তেই পারে না।' বললে ত্রিয়ঁ, 'আমি তো তোকে জানি—কোনো কারণ না থাকলে এমনিতে গোমড়া মুখে ব'সে থাকার ছেলে তুই নোস। বল, কী হয়েছে—দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।'।

জাক তো কিছুই বলতে চায় না, কেবলই এড়িয়ে যায়। কিন্তু ত্রিয়ঁও নাছোড়বান্দা। শেষকালে অনেক পেড়াপিড়ির পর জাক বললে, 'আচ্ছা আরেকদিন সে-কথা তোমায় বলবো, আজ নয়। আগে আমি একটু ভেবে নিই।'।

কী ভেবে ত্রিয়ঁ আর তখনকার মতো তাকে কোনো কথা বললে না। কিন্তু বুঝতে পারলে যে জাক নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কথা লুকোতে চাচ্ছে—আর তার সেই গোপন কথা ভারের মতো তার বুকে চেপে ব'সে আছে বলেই সব সময় সে কেমন একা একা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়।

ত্রিয়ঁ নিজেই কিছুটা উদ্ভিন্ন হয়ে পড়লো।

গরুড়নরা যখন ভিক্যুনা ও গুঅনাকো নিয়ে সদলবলে ফিরে এলো, তখন আরেকটি সমস্যা দেখা দিলো, যার আশু সমাধান তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়লো।

জানোয়ারগুলির জন্তে এবার একটা ঘরের দরকার। ধীপে অবিষ্টি গাছের অভাব নেই, আর ছেলেদেরও স্বরূপতি সাজ-শরঞ্জামের অভাব নেই। কয়েকদিন ধরে অবিষ্টিম করাত, র'য়াদা, বাটাসি, হাতুড়ি, পেরেক ব্যবহার ক'রে ছেলেরা

জন্তুদের জন্তু একটা কাঠের ঘর তৈরি করে ফেললে। বেশ বড়ো-শড়োই করলে তারা ঘরটা, যাতে অন্তত গোটা-তিরিশেক জন্তু থাকলেও কোনো অসুবিধে না হয়। ৩বিষ্ণুতে তাদের সংখ্যা যে বাড়বে না তা-ই বা কে বলতে পারে? ওদিকে উইলকল্প রোজ ফাঁদ পেতে রাখে। সেদিন তার ফাঁদে আরেকটা গুঅনাকো ধরা পড়লো। তারপর সাত দিন যেতে না যেতেই একদিন ফাঁদের মধ্যে একসঙ্গে একজোড়া ভিক্যুনা পড়লো। আরেকদিন পড়লো একটা উটপাখি—যদিও তাকে দেখে সবাই আগেরটা ব'লেই ভুল করলে, সারভিস বললে এটা নাকি নতুন। হবেও বা—আগেরটার মুখে তো লাগাম পরানো ছিল—এটার মুখে সে-সব কিছুই নেই। কিন্তু নতুনই হোক আর পুরোনোই হোক—ওই উটপাখি দেখেই সবার হাড়পিণ্ডি জ'লে গেলো। কিন্তু সারভিসের চোখ উৎসাহে আবার জলজল ক'রে উঠলো। এবারেও সে উটপাখিটাকে পুষবার জন্তে নিয়ে গেলো। তার এই প্রজলন্ত উৎসাহ দেখে কেউ আর বাধা দিলে না, যদিও সবাই ধ'রেই মিলে যে এবারেও উটপাখির অকৃতজ্ঞতায় সারভিস তিন দিন ধ'রে বকবক করবে শেষটায়।

কিন্তু এ ছাড়াও ছেলেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পরিধি আরো বিস্তৃত হ'লো। ফাঁদ পেতে বখন বুনো জানোয়ার ধরা যায়, তখন আকাশের পাখিই বা ধরা যাবে না কেন? এ-বিষয়ে মোকোর সাহায্য নিয়ে মাওরিদের ধরনে তারা পাখি ধরার ফাঁদ পাতলে। এ-বেলা ফাঁদের ওপর কিছু খাবার রেখে এসে ও-বেলা গিয়েই দ্যাখে ফাঁদে তিন-চারটে পাখি পড়েছে। এভাবে রোজ তারা হরেকরকম পাখি ধরতে লাগলো : গিনিফাউল, বুনো পায়রা, বন-মোরগ, বাস্টার্ড। কতগুলোর আবার নামও তাদের জানা নেই।

জাহাজে প্রচুর লোহার তারের জাল ছিলো। তাই দিয়ে তারা একটা মস্ত পাখির বাসা তৈরি করলে। যে-সব পাখি এসে ফাঁদে পড়তো, তাদের এনে তোলা হ'তো সেই পাখির বাসায়। এক মাসের মধ্যেই তারা আবার ডিম পাড়তে শুরু ক'রে দিলে। কতক ডিম বাচ্চা হবার জন্তে রেখে দিয়ে কিছু ডিম তারা নিজেদের খাবার জন্তে নিয়ে আসতো।

এইসব কারণে এখন তাদের দিন বেশ ভালোই কাটে। বোঝাই যায় না যে কোনো নির্জন দ্বীপে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। খাবার কোনো অভাব নেই। মাংস, ডিম তো প্রায় প্রত্যেক দিনই। তার উপর গুহার দু'পাশে লাগানো শব্জি-বাগান এখন তো প্রায় জল হ'রে উঠেছে। কত আর খেয়ে শেষ করতে পারবে তারা?

একদিন যোকে তাদের আলোচনাচক্রে বললে, 'তোমরা গুলি ক'রে পাখি মারো কেন ? তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারো না ?'

তীর-ধনুকের কথা শুনেই ডোনাগান ছাড়া অন্য সকলেরই বুকের ভিতর ঐতিহাসিক একটা লুকোনো স্পন্দন জেগে উঠলো। রক্তের ভিতরে কোথায় যেন চাপা প'ড়েছিলো মানবজাতির আদিপুরুষদের ধ্যান ধারণা—এখন শোনা-মাত্র চঞ্চলভাবে তা ধমনীর মধ্যে ব'য়ে যেতে লাগলো।

জীল্যাণ্ড রিভারের দুই তীরে ছিলো নলখাগড়ার জঙ্গল—মহোৎসাহে তার বেত থেকে তীর, আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ধনুক তৈরি করা হ'লো। দেখতে-দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই বাস্‌টার, ক্রস আর উইলকস্স তীর ছুঁড়তে একেবারে ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো—বলাই বাহুল্য সকলের সেরা হ'লো বাস্‌টার। তার তাগ কখনও কশকায় না, আর এ-সব বিষয় তার আসেও ভালো। গাছের ডালে কোনো পাখি ব'সে আছে দেখলেই তারা পাখি-শিকার করার জন্তু নিশপিশ ক'রে ওঠে। গরডন তা এখন সকলের উপর কড়া হুকুম জারি করেছে, কেউ কোনো অজুহাতে মিছিমিছি আর গুলি-বাকদ নষ্ট করতে পারবে না।

ওদিকে কিন্তু তাদের সব মোমবাতি আর তেল ফুরিয়ে যাচ্ছিলো। জাহাজের পিপে-ভর্তি তেলও আর নেই, মোমবাতির সংখ্যাও ক্ষীয়মান। তাই ত্রিয়ার প্রস্তাব করলে, এবার একদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে সীল শিকার ক'রে আনা হোক। আগামী শীতের জন্তু এখন থেকেই আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। পরামর্শমতো একদিন সবাই বন্দুক নিয়ে সমুদ্রতীরে সীল-শিকারে চললো। প্রথমে ঠিক হয়েছিলো, ছোটোদের গুহার যেথেকে যাওয়া হবে ; কিন্তু শেষটার গরডন বললে, 'সবাই চলুক। ছেলেরা অনেকদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাননি—একবার যুরে এলে সকলেরই খুব ভালো লাগবে।'

শিকারে যেদিন বেরোলো আকাশ সেদিন খুব পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল ; আবহাওয়ার মেজাজও খুব ভালো, চারধারে যেন প্রসন্ন রৌদ্রের উৎসব মেগে গিয়েছে। ছেলেরা সঙ্গে দুটি গুঅনাকো আর সেই গাড়িটা নিয়ে চললো। গুঅনাকোগুলো এখন বেশ পোষ যেনে গিয়েছে, গাড়িতে জুড়ে দিলে বেশ সুন্দর গাড়ি টানে।

ছেলেরা গাড়ির উপর ডজনখানেক পিপে তুলে দিলে। ইচ্ছে : সমুদ্রের ধার থেকেই সীলগুলো থেকে চর্বি বার ক'রে পিপে ভর্তি করে গুহার নিয়ে আসবে। গুহার কাছে সীলগুলোকে নিয়ে এলে পচা গন্ধ আর টেঁকা যাবে না।

জীল্যাও মদীর তীর ধ'রেই তারা সমুদ্রের দিকে চললো। গাড়িটা দিবা চলেছে। মাইল চারেক এগুবার পর ইভারসন, ডোল আর কোসটার ব্যস্ততা ধরলে, তারা আর হাঁটতে পারছে না, তারা গাড়িতে ক'রে বাবে। কিন্তু তারা তাদের আকার মেনে নিলে—চটপট তাদের গাড়ির উপর চাপিয়ে নেওয়া হ'লো।

সুনার উপসাগরের তীরে এসে যখন পৌঁছোলো, বেলা তখন দশটা। দূর থেকেই চোখে প'ড়লো, সেই বিস্তীর্ণ বেলাসুন্নির উপর ছোটো-বড়ো অজস্র সীলমাছ খেলা করছে। কেউ-বা পাথরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বোদ পোয়াচ্ছে, কেউ-বা বেড়াচ্ছে ছুটোছুটি ক'রে। জীবনে হয়তো এরা কখনও মানুষ চোখে আঁখনি। তা নইলে কি আর অমন নিঃশব্দচিত্তে তারা খেলা করতে পারতো ?

আক্রমণের সব প্ল্যান খাড়া করা হ'লো। তারপর সব বন্দোবস্ত ক'রে বন্দুক হাতে জনকয়েক এগলো সমুদ্রের দিকে। আজ আর গুলি-বাকুদের মায়া করলে চলবে না। এখন যত সীল মারা যাবে, ততই ভালো। সীলদের পক্ষে, বলাই বাহুল্য, দিনটা আদৌ শুভ ছিলো না।

প্রথমে তারা একে অন্নের মধ্যে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে তাঁদের মতো গোল হ'য়ে স্বীপের দিক থেকে সমুদ্রের দিকে এগুতে থাকলো, তারপর যেই সীলরা তাদের বন্দুকের নাগালের মধ্যে এলো, অমনি ডোনাগান আগের ব্যবস্থা-মতো সংকেত করলে, আর সবাই এক নিঃশ্বাসে গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিলে। বন্দুক যাদের হাতে ছিলো তাদের সকলেরই ভাগ ভালো—কিছুতেই নিশানা ব্যর্থ হয় না। বেছে-বেছে তাদের হাতেই বন্দুক দেয়ার কারণ হ'লো, যাতে একটা গুলিও বাজে খরচ না-হয়। সত্যি, প্রায় কোনো গুলিই নষ্ট হ'লো না তাদের। বলতে গেলে, একেকটা গুলিতেই একেকটি সীল কাত—গুলি গায়ে লেগেছে আর সীলগুলো সোনালি বালিতে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে। তারা আহত হ'লো না, তারা মাথা তুলে লাজ নাড়তে-নাড়তে হুড়মুড় ক'রে সমুদ্রে গিয়ে নামলো।

সীল-শিকারের নেতা ছিলো ডোনাগান। বন্দুক ফেলে দিয়ে রিডলভার হাতে সে তখন চরকির মতো সীলদের পিছন-পিছন ঘুরতে লাগলো। সত্যি বলতে কি, সে তখন একাই একশো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিকারপর্ব শেষ হ'লো। তখন গুনে দেখা গেলো, গোটা-তিরিশেক সীল বালির উপর ম'রে প'ড়ে আছে। তখনকার মতো কেউ

আর সীলগুলিকে স্পর্শ করলে না। জীল্যাও নদীর টলটলে স্বচ্ছ জলে ঘান
সেরে সবাই একটু জিরিয়ে নিতে বসলো। তারপর বেলা দুটোর সময় তারা
ছুরি আর কুঠার নিয়ে আবার সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হ'লো।

এবারে শুরু হ'লো এক বীভৎস কাণ্ড। কিন্তু যতই খারাপ লাগুক,
একাজটা না-করলে তাদের চলবেই না। সমস্ত বিকেল ধ'রে তারা সীলগুলোকে
ছাড়িয়ে ভিতরকার মাংস টুকরো-টুকরো করলে। সকলে তখন রক্তে, চর্বিতে
আর মাংসের টুকরোয় মাখামাখি। কিন্তু এখন আর ঘেমা করলে চলবে কেন ?

ওদিকে কিছু দূরেই কতগুলো পাথর সাজিয়ে উল্লুনের মতো ক'রে মোকো
তার উপর এক প্রকাণ্ড কড়াই চাপিয়েছে। কড়াইতে জল ঢেলে সে উল্লুনে
আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর সীলগুলোকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সেই
কড়াইতে বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরোগুলি চাপিয়ে দেওয়া হ'লো।

জল ফুটতে শুরু করতেই উপরে পরিষ্কার তেল ভেসে উঠতে লাগলো।
একটু মোটা পরদার মতো হ'লেই তারা হাতা দিয়ে সেই তেল ডেকচি থেকে
পিপেয় ঢালতে লাগলো। দুর্গন্ধে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর—
পেটের সব নাড়িভূঁড়ি যেন উলটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেই বদ গন্ধের মধ্যে
নাক টিপে তারা কোনোরকমে সেই দুর্গন্ধ কর্ম সাধন ক'রে যেতে লাগলো।
রাত আটটা পর্যন্ত মাংস সেদ্ধ হ'লো, কিন্তু তখনও অর্ধেক মাটিতে প'ড়ে আছে।
কাজেই পরের দিন সকালেও আবার মাংস সেদ্ধ ক'রে তেল বার ক'রে নেয়ার
কাজ চলতে লাগলো। একটানা বিকেল পর্যন্ত সেই কাজ চললো। তেল-কালি
মেখে বিকেলবেলায় একেকজনকে দেখালো ঠিক ভূতের মতো।

সারাদিন সমুদ্রতীরে তারা কাজ করলো, আর আশ্চর্য হ'য়ে দেখলো যে
আজ আর একটাও সীল বেলাভূমিতে ওঠেনি। নিশ্চয়ই সীলদের দেশে মস্ত
রব উঠে গিয়েছে, 'সাবধান! তীরে কেউ যেয়ো না, সেখানে মাহুঘ নামক
দু-পেয়ে জন্তুরা রক্তারক্তি কাণ্ড করছে!' ভয়ানক ভয় পেয়েছে নিশ্চয়ই
বেচারিরা।

সন্ধ্যাবেলায় বারোটা পিপেতেই কানায়-কানায় ভর্তি করা হ'লো তেল।
সেই কয়েকশো গ্যালন তেলে তাদের সারা নীতকালটা ভালোভাবেই কেটে
যাবে। বাতির জ্বলে আর তাদের ভাবতে হবে না।

বড়োদিন এসে গেলো দেখতে-না-দেখতে।

কিন্তু বড়োদিন হলে কি হয়, চারম্যান আইল্যাও তখন পুরোদস্তুর
গ্রীষ্মকাল। ধীপটা যে কোন উলটো মূলুকে, কে জানে! এখানে এপ্রিল মাসে

বরফ পড়ে, ডিসেম্বরে কড়া রোদ। রাতের বেলায় তারা ওঠে—তারও ল্যাজে-মুড়ায় মস্ত গুগোল, তারাও ওঠে উন্টে।

বড়োদিন বলে সব কাজ বন্ধ রেখে ছেলেরা উৎসবের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো। ফরাশি গুহার দরজা তারা রঙ-বেরঙের নিশান আর লতা-পাতার শেকল দিয়ে সাজিয়েছে, চারদিকে ঝুলিয়েছে রঙিন ফানুশ।

ফরাশি গুহার ছুয়ারে দু-দিকের দুটো ঘুলঘুলির মধ্যে তারা কামানছটোর মুখ চুকিয়ে রেখে দিয়েছিলো। বড়োদিনের দিন সকালবেলায় ডোনাগান কামানে বারুদ পুরে পনেরোটা ফাঁকা আওয়াজ করলে। বড়োদিনের আগে-পরে ছেলেরা ভালো-ভালো পোশাক পরে চারদিকে হই-হল্লা ক'রে বেড়ালে, মোকোর রন্ধনশালায় আয়োজন হ'লো ভূরিভোজের। বড়োদিনের দুপুর বেলায় খেলা হ'লো ক্রিকেট : চারমান আইল্যাণ্ড শামনকর্তার একটা দল, ডোনা-গানের আরেকটা দল। গরডন মার্কিন আর ব্রিগ'ারা ফরাশি, কিন্তু হ'লে কি হয়, লোপ্লা বলে বেধড়ক পিটিয়ে রান করার কেউ কম যায় না। বিকেল-বেলায় আবার ফুটবল খেলাও হ'লো। রাত্তিরে এমনকি একটা নাটক পর্যন্ত অভিনয় করলে : শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' আর 'ভেনিসবাসী সদাগর' থেকে বাছাই-করা দৃশ্য অভিনীত হ'লো। তরু পোতে তারা একটা মঞ্চ বানিয়ে নিয়েছিল, আর জাহাজের পাল দিয়ে বানিয়েছিল যবনিকা। সব-শেষে ডোনা-গানের সুন্দর আবৃত্তি শুনে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো।

তারপর এলো নববর্ষ।

এই দ্বীপে তাদের আরো কতকগুলো নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে, তা শুধু বীশুই জানেন। দশ মাসের উপর হ'লো তারা এই নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে—অথচ আজ পর্যন্ত উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। জীবন-যাত্রার সব দরকারি জিনিশপত্র তারা নিজেদের বুদ্ধিতে জোগাড় ক'রে নিয়েছে—এমন নয় যে দ্বীপে হই-হল্লোড়ের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু তাই বলে স্বদেশকে কি ভোলা যায় কখনও? ভোলা যায় আত্মীয়-স্বজনদের ?

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি—কত দেশের কত শত জাহাজ দিনরাত্রি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র ভোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এমন এক দ্বীপে তাদের নির্বাসন হ'লো, যার ত্রিসীমানা দিয়েও কোনো জাহাজ যায় না।

তবু ভালো যে আজ অবধি কারু তেমন অসুখ-বিসুখ হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে :

তাদের কতরকম বিপদ আপদ হতে পারে। তখন ? তখন এই অতগুলো ছেল
কী করবে ? ওদিকে আর কয়েকমাস পরেই ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করবে। কুমেরু
অঞ্চলের সেই ভীষণ শীত কি আবার তাদের ভোগ করতে হবে ?

ফ্যামিলি লোক পেরিয়ে

কাউকে দেখে তো মনে হয় না যে কারু মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আছে।
সকলেই বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু ব্রিয়ঁর মনে আর শাস্তি নেই।
কবে যে এই রান্নাসে দ্বীপ থেকে রেহাই পাবে, কিংবা আদৌ পাবে কি না
কখনও, তাই বা কে জানে।

এদিকে আবার শীত আসন্ন। পোষা জন্তুগুলি এখন সংখ্যায় অনেক বেড়ে
উঠেছে ; শীতের সময় তাদেরও নিরাপদে রাখা দরকার।

ব্রিয়ঁ সকলকে নিয়ে তাদের জন্তু আবার ভালো একটি বাসা তৈরি করার
কাজে লেগে গেলো।

শীত আসবার আগে আরেকটি কাজও করা দরকার। ফ্যামিলি লোকের
পূর্ব-তীরটা একবার ভালো করে দেখে আসা উচিত। সেদিকটায় কী আছে
কিছুই জানা নেই, কেবল ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁর সেই মানচিত্রটিই নির্ভর।

একদিন ব্রিয়ঁ গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'দ্যাখো গরডন,
বদোয়ঁর ম্যাপ যতই বলুক না কেন দ্বীপের পূর্বদিকে সমুদ্রের উপরে ধারে-
কাছে কোনো ডাঙা নেই, তবু আমাদের নিজেদের ওদিকটা একবার পরীক্ষা
করে দেখা দরকার। সঙ্গে আমাদের ভালো দুইরবিন রয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী
দুইরবিন—হয়তো বদোয়ঁর তা ছিলো না।'

গরডনের কোনো আপত্তি ছিলো না। বদোয়ঁর মানচিত্র মোটামুটি
নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রিয়ঁর কথাতো শুধু সারবন্দা রয়েছে। ঠিক
হ'লো, এখানে শুধু ব্রিয়ঁ আর তার ভাই জাক যাবে—আর সঙ্গে থাকবে
মোকো। যেহেতু মোকোর ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেইজন্যে সঙ্গে
মোকোর মতো একজন পাকা নাবিক থাকা উচিত।

সেই বন্দোবস্ত অল্পস্বামী ঠা কেঁরয়ারি সকাল আটটায় তিনজনে মোকো
ছেড়ে দিলে। তখন হাওয়া আসছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে—তাতে

তাদের স্মৃতিধেই হ'লো। নৌকায় পাল তুলে দিয়ে মোকো হাল ধ'রে বসলো।
আস্তে ভেসে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো এসে পড়লো ফ্যামিলি লেকের
মাঝখানে।

হ্রদের মাঝখানটায় বেশ বড়ো-বড়ো ঢেউ। মনে হয়, এ ঘেন সামান্য হ্রদ
নয়, ঘেন কোনো বিরাট নদীর উপর দিয়ে তাদের ছোট্ট ডিঙি ভেসে যাচ্ছে।
বেলা তিনটের সময় ত্রিয়ঁ। ছুরবিন দিয়ে হ্রদের অন্য পাড়টি দেখবার চেষ্টা করলে।
ঝাপসা মনে হ'লো, দূরে ঘেন কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাঙা।

বেলা চারটের সময় হ্রদের তীরের গাছপালা বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। হ্রদের
পশ্চিম অংশ বেশ গভীর, কিন্তু পূর্বদিকে হ্রদের জল অত্যন্ত কম। কাঁচের মতো
স্বচ্ছ টলটলে জলের ভিতর দিয়ে এমনকি হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট চোখে
পড়ছিলো। নানা রকম আগাছা, শাওলা ও জলের উদ্ভিদ তলায় তালগোল
পাকিয়ে আছে, আর তারই মধ্য দিয়ে ছোটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে অজস্র ছোটো-
বড়ো মাছ।

ত্রিয়ঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উত্তর দিকে গেলে মানচিত্র-বর্ণিত সেই
নদীটির খোঁজ পাওয়া যাবে। ত্রিয়ঁর অহুমানই যে ঠিক, তা একটু পরেই
বোঝা গেলো, যখন তাদের নৌকো খানিক বাদেই নদীর মুখে এসে পড়লো।
হ্রদ থেকে বেরিয়ে নদীটা পূর্বদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

জাক বললে, 'নদীটার একটা নাম দেবো না আমরা? সব কিছুই যখন
নাম দেয়া হয়েছে, তখন এটাই বা বাকি থাকে কেন?'

'নিশ্চয়ই দেবো।' তক্ষুনি উত্তর দিলো ত্রিয়ঁ। 'আমি বলি কি, এর
নামটা একেবারে সরাসরি ঈস্ট রিভার রেখে দেয়াই ভালো। কাল সকালে
আমরা এই নদী দিয়েই নৌকো চালিয়ে যাবো।'

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, কাজেই আর এগোবার চেষ্টা না ক'রে তারা
সেখানেই নৌকো ভিড়িয়ে দিলো। তারপর নৌকো থেকে একটা প্রকাণ্ড ওক
গাছের তলায় তারা তাঁবু খাটালো; তাঁবুর সামনে জড়ো করা হ'লো প্রচুর
শুকনো ডালপালা, তারপর সেই শুকনো ডালপালায় তারা আগুন ধরিয়ে
দিলে। রাতটা তারা এখানেই কাটাবে। অচেনা জায়গা, অন্ধকারে কখন কোন
বুনো জন্তু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে কে জানে! তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার
জন্মেই এই অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করলে ত্রিয়ঁ।

রাত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। পরদিন একেবারে ভোর
ছ-টার মোকো আর জাককে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে চটপট ছোটোহাঙ্গরি লেরে

নিয়ে ত্রিয়ঁ নৌকো ছেড়ে দিলো। বেশ শ্রোত আছে নদীতে, ছোট কুলকুল আওয়াজ ক'রে জল ব'য়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ হুদে ঢেউ ধত ছিলো তত শ্রোত ছিলো না, এখন হুদের প্রচুর জল তরতর করে নদী দিয়ে ব'য়ে চলেছে, তাই এখন আর তাদের দাঁড় টানতে হ'লো না।

মোকো বললে, 'এই এক জোরারেই আমরা নদীর এই ছ-মাইল পথ পেরিয়ে যাবো। খামকা দাঁড় টেনে আর কাউকে কষ্ট করতে হবে না।'

প্রথমটা নদীর ছ-তীরে ছিলো ঘন জঙ্গল। কিন্তু বেলা এগারোটোর পর থেকে ছ-দিকের গাছপালা আশু-আশু কাঁকা হ'য়ে এলো। বাতাসে বেশ-একটা কড়া মৌনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—একটু যেন আমিষমাখা সেই গন্ধ। ঘণ্টাখানেক পরে দূরে দিগন্তের কাছে এক বাঁকা নীল রেখা জেগে উঠলো—অর্থাৎ সমুদ্র দেখা দিলো তাদের কাছে।

বাম তীরে নৌকো বেঁধে তিন জনে বেলাভূমির হলুদ-সোনালি বালিরাশির উপর গিয়ে নামলো। অবাক কাণ্ড! এখানে সমুদ্রের ধারে এত বেশি পাহাড় কেন? চারদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়, তবে সবগুলোই এত ছোটো যে পাহাড় না ব'লে হয়তো টিলা বলাই সংগত।

ঘুরতে ঘুরতে ত্রিয়ঁ সেই টিলাগুলোর মধ্যে প্রায় কুড়িটা গহ্বর আবিষ্কার করলে। আহা, তাদের জাহাজটা যদি এদিকে এসে ভিড়তো তো তাদের আর ভাবনা ছিলো না। এত কষ্ট ক'রে সমুদ্র থেকে অত দূরে ফরাশি গুহার গিয়ে হয়তো আশ্রয় নিতে হ'তো না।

একটু পরে তারা নদীর তীর ধ'রে এগিয়ে সমুদ্রের ঠিক উল্টোদিকের বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। বনের মধ্যে কত রকমের যে পাখি! ত্রিয়ঁ গুলি ক'রে ছ-চারটে পক্ষী শিকার না ক'রে পারলে না; এত পাখি দেখে প্রথমত তার হাত নিশপিশ করছিলো, দ্বিতীয়ত নৌকায় যে খাবার আছে তাতে আপাতত হাত না দেয়াই শ্রেয় কারণ এই অভিযানে যদি অভাবিতরূপে বেশি সময় লেগে যায়?

শিকার সাজ ক'রে বন থেকে বেরিয়ে এলো তারা, আবার সেই বেলাভূমির টিলাগুলোর মধ্যে ঘুরতে লাগলো। টিলাগুলো যেন আগলে আদৌ টিলাই নয়—কে যেন কতকগুলো মস্ত অতিকায় পাখর জড়ো ক'রে রেখেছে। আর এরই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ত্রিয়ঁ এক সময় ছোটো-বড়ো দশ-বারোটা ঘর আবিষ্কার করলে—হুন্দর-হুন্দর গ্র্যানাইট পাথরের ঘর। বলাই বাহুল্য ঘর নয়, কিন্তু এমন-ভাবে প্রকৃতিঠাকরন পাথরগুলো সাজিয়ে রেখেছেন যে ঘর ব'লেই ভ্রম হয়।

বেলা প্রায় দুটো। বেশ কড়া রোদ উঠেছে, আলোও বেশ তপ্ত ও বলমলে।

একটা উঁচু টিলায় উঠে তারা দেখতে পেলো, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে হৃদয়বিহ্বত বালির পাহাড়, আর উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রুক্ষ উষর মরুভূমি। অর্থাৎ দ্বীপের মাঝখানটি ছাড়া আর সবকিছুই বাগের সম্পূর্ণ অধোগ্য। মাঝখানে ওই বিশাল হ্রদটা আছে বলেই তার আশপাশে অমন গভীর জঙ্গল, অমন শ্রামল সমভূমি। আর পূবদিকে বালিয়াড়ি টিলায় ভরা, তারপরে সীমাহীন দুস্তর সাগর। কিন্তু সমুদ্রের ওদিকে কি কোনো ডাঙাই নেই? চোখে ছুরবিন লাগিয়ে বারে বারে তিনজনে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলে। একবার ত্রিয়ার ঠাণ্ডা, একবার জাক, আরেকবার হয়তো মোকো।

হঠাৎ মোকো চেষ্টা করে উঠলো, 'ও কী! ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

তখন ত্রিয়ার তার হাত থেকে ছুরবিনটা ছিনিয়ে নিলে। চোখে দিয়ে দেখলে—অবাক কাণ্ড!—এতক্ষণ তাদের চোখে পড়েনি কেন?

দূরে, অনেক দূরে, হৃদয় পূব-দিকচক্রবালে নীল আকাশের গা ঘেসে ঠিক যেন মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে—হয়তো কোনো ধূসর পাহাড়ই বুঝি বা হবে। পাহাড়ই হোক আর যা-ই হোক, সমুদ্রের কোলে পূবদিকে যে আরেকটা কিছু ধূসরবর্ণ জিনিশ দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

দস্তুরমতো উত্তেজিতই হয়ে পড়লো তিনজনে। স্থির, অনড় ধূসর পদার্থ, স্মরণীয় বোঝা গেলো কোনো জাহাজ নয়। তাহলে কি ডাঙা? আরেকটা দ্বীপ? কোনো মহাদেশের ল্যাজের দিক—অন্তরীপের মতো সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে? এমনি নানা কথা তারা আলোচনা করলে।

সন্ধ্যা নেমে আসতেই তিনজনে ঈর্ষ রিভারের মোহানার কাছে ফিরে এলো। কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন জালিয়ে নিয়ে, দিনের-বেলায়-শিকার-করা পাখির মাংস দিয়েই নৈশভোজ সমাপন করলে তারা।

তখনও জোরার আসেনি, জোরার আসতে অনেক দেরি। হাতে কোনো কাজ নেই বলে তিনজনে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি সাতটা বেজে গেলো, চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। মোকো নৌকোর ফিরে এসে ঠাণ্ডা ওরা দু-ভাই তখনও করেনি।

বনের মধ্যে তারা কোনো বিপদে পড়েনি তো?

মোকো নৌকো থেকে তীরে নেমে পড়লো আবার। আর তীরে নামতেই হঠাৎ তার কাছে গেলো কাছেই কে বেশ হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদার

শব্দটা ভেসে আসছে বনের মধ্য থেকে । আরেকটু উৎকর্ণভাবে শুনলো মোকো :
আরে—কারার সঙ্গে-সঙ্গে যে ত্রিয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে ।

মোকো তক্ষুনি বনের দিকে এগিয়ে গেলো ।

খানিকটা গিয়েই শুধে, কী আশ্চর্য, ত্রিয়ার খুব গভীর মুখে একটা গাছের
গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে আর তার সামনে নতজানু হ'য়ে বসে তার
ছোটো ভাই জাক ; আকুল গলায় সে মাপ চাইছে তার দাদার কাছে ।

মোকো কিছু বুঝতে পারলো না তার কী করা উচিত । দুই ভাইয়ের
ব্যক্তিগত কথার মধ্যে গিয়ে পড়া উচিত, না এখান ছেড়ে চলে যাওয়াই ঠিক—
তা সে কিছুতেই স্থির করতে পারছিলো না, ফলে সেই ন বর্ষো ন তর্ষো
অবস্থায় গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলো সে, আর দুই ভাইয়ের কথাবার্তা
শুনতে লাগলো ।

একটু পরেই সমস্ত ব্যাপারটা মোকোর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো ।
আগাগোড়া ব্যাপারটা অনুধাবন করার সঙ্গে-সঙ্গে সেও প্রথমটা যেন পাথরের
মূর্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো—কিন্তু তারপরে বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ
ক'রে কী ভাবতে-ভাবতে নিঃশব্দে আবার ফিরে এলো নোকোর ।

দুই ভাই যখন ফিরে এলো, তখনও জোয়ার আসেনি ।

জাক নোকোর না-এসে তীরেই বালির উপর বসে গালে হাত দিয়ে
অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে রইলো । তার মুখটা ধমধমে—অঙ্ককারের মধ্যেও
বোঝা যাচ্ছিলো ।

নোকোর গলুইয়ের উপর কেবল ছোট্ট একটা লণ্ঠন জ্বলছে । নোকোর
উপর বসে আছে ত্রিয়ার । আর মোকো—কেউ কোনো কথা বলছে না—দু'জনেই
ষে-যার ভাবনায় তন্ময় ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ শেষে মোকো বললে, 'তোমাদের সব কথাই
আমি শুনেছি ।'

'কী শুনেছো, মোকো ?' ত্রিয়ার চমকে উঠলো ।

'জাক যে-কাণ্ড করেছে ।'

'তুমি বুঝি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছো ?'

'হ্যাঁ ।' মোকো জবাবদিহির কোনো চেষ্টাই করলে না : 'কিন্তু তাকে
তোমার ক্ষমা করা উচিত ।'

'আমি তো ক্ষমা করেছি মোকো, কিন্তু অস্ত্র সবাই ? তারা কি ক্ষমা
করবে ? তুমি কি করবে ?'

‘খামার তো কোনো প্রস্বই গুঠে না। অন্দেরও তাকে কমা করা উচিত। কিন্তু তারা এ-কথা না-ই বা জানলো! কী দরকার তাদের জানিয়ে?’

‘মোকো! মোকো!’ ত্রিয়ঁ আর সামলাতে পারলে না, মোকোর হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। ‘তুমি জাককে কমা করো—সে মারাত্মক অপরাধ করেছে!’

মোকো কোনো কথা না-ব’লে নিঃশব্দে ত্রিয়ঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার রেশমের মতো চুলগুলো কপালের দু-পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো। যেদিন নোঙর-হেঁড়া জাহাজটি ঝোড়ো সমুদ্রে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিলো, সেদিন থেকেই সে দেখে আসছে এই করাশি কিশোরটি কেমন ক’রে নিজের কাঁধে সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে—বুদ্ধিতে, কৌশলে, সাহসে তার কোনো তুলনা সে ছাখেনি। আজ তাকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে দেখে এই আদিবাসী মাওরি কিশোরটির বুকের ভিতরটা ছ-ছ ক’রে উঠলো। সে মনে-মনে নিজের ভাষায় মাওরি দেবতার কাছে এই কিশোরটির জন্মে প্রার্থনা করলো বারবার।

আন্ডে-আন্ডে রাত দশটা বেজে গেলো। জোয়ার এলো, জল টান দিলো নৌকোকে—জাককে নৌকোর ডেকে তারা নৌকো ছেড়ে দিলো।

পরদিন বেলা দশটার সময় একেবারে করাশি গুহার কাছে গিয়ে তারা মোকো বাঁধলে। ইভারসন তখন ছিপ ফেলে বসে মাছ ধরছিলো হুদে : ত্রিয়ঁদের দেখেই সে চ্যাচামেচি ক’রে সকলকে ওদের আসার খবর জানিয়ে দিলো।

ত্রিয়ঁ তাদের অভিযানের সব কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করলে, বললে না কেবল জাকের কথা।

সবাই বুঝতে পারলে, চারম্যান আইল্যাও পৃথিবীর সমস্ত সংস্পর্শ থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না-পেলে তাদের পরিজ্ঞানের কোনো আশা নেই। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত সমুদ্রে বাইরে থেকে সাহায্য কি আর আদৌ আসবে—এদিক দিয়ে তো কোনো জাহাজই যেতে দেখলো না তারা এতদিনে।

নতুন দলপতি

২৫শে এপ্রিল বিকেলবেলায় একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ত্রিয়ঁ আর ডোনাগানের মধ্যে বিত্ৰী একটা ঝগড়া হ'য়ে গেলো।

দোষটা ডোনাগানেরই বেশি।

বিশেষ ক'রে গণ্ডগোলটার উদ্ভব যেহেতু হ'লো খেলার মাঠে, সেইজন্নেই ডোনাগানের দোষটা বেশ জলজল ক'রে উঠলো। খেলায় এক দলের ক্যাপটেন ছিলো ডোনাগান, অন্য দলের ত্রিয়ঁ। ডোনাগানের দল হেরে গেলে ডোনাগান খামকা ত্রিয়ঁকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করলে। গালাগাল শুনে ত্রিয়ঁ প্রথমটা খুব উদ্ভেজিত হ'য়ে পড়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রভাবে তার প্রতিবাদ জানালে।

ত্রিয়ঁর ভদ্র কথা শুনে ডোনাগান বনবেড়ালের মতো ফোস ক'রে উঠলো, 'তোমাকে আর ধর্মের বুলি আওড়াতে হবে না, কাপুরুষ কোথাকার! ও-সব সুসমাচার আমি ঢের-ঢের শুনেছি!' ব'লে ডোনাগান ঘুসি পাকিয়ে তার দিকে ভেড়ে গেলো।

এক হাতে তাকে ঠেকিয়ে ত্রিয়ঁ বললে, 'আমি কাপুরুষ! তবে এই ছাখো, ডোনাগান!' এই ব'লে অন্য হাতে তার মুখে এক প্রকাণ্ড ঘুসি কষিয়ে দিলো সে।

গোলমাল শুনে গরুডন ছুটে এসে দু'জনকে দু'দিকে টেনে ধরলে।

ডোনাগান হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ত্রিয়ঁ আমাকে মিথুক বলেছে, গরুডন!'

ত্রিয়ঁও তেমনি আকুল গলায় বললে, 'আর ও আমাকে ভণ্ড, জোচ্ছোর, কাপুরুষ বলেছে!'

গরুডন তখন অন্তদের কাছ থেকে সবিস্তারে সব শুনে বললে, 'ডোনাগান, এক্ষেত্রে কিন্তু তোমারই দোষ বেশি।'

ডোনাগান এবার ভয়ানক রেগে উঠলো। 'বটে? দোষ আমার? তা তোমরা একচোখো লোক তো আমার দোষ দেখবেই!'

এবার গরুডন গর্জন ক'রে উঠলো, 'হ্যাঁ, দোষ তোমার! তোমার মতো এ-রকম বদমেজাজি হিংস্রটে ছেলে বিখে আর দুটো নেই!'

তার কথা শুনেই ডোনাগান বিক্রপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো, 'ত্রিয়ঁ, তোমার উচিত গরডনকে অভিনন্দন জানানো! ওর অমন সব মধুর মতো কথা কি নিষ্ফল যাবে?' এই ব'লে সে আবার ত্রিয়ঁর দিকে এগিয়ে গেলো।

গরডন চটপট মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো : 'সাবধান, ত্রিয়ঁর গায়ে তুমি হাত দিয়ে না, ডোনাগান! ওর গায়ে যদি আঁচড়টি লাগে, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। জানো, আমি তোমাদের দলপতি—আমার কথা তোমাদের মেনে চলতেই হবে। যে না-শুনতে চায়, সে এখান থেকে চ'লে যেতে পারে। ডোনাগান, আমি তোমাকে আবার বলছি, তুমি যদি ঠাণ্ডাভাবে এখানে সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে না থাকতে পারো তো তুমি চ'লে যাও এখান থেকে! তোমার দলবল নিয়ে অন্য কোনোখানে থাকো গে, যাও!'

গরডনের কঠিন, অসুস্থজিত, চাপা গলার ভংসনা শুনে ডোনাগান আর-কোনো কথা না-ব'লে নীরবে মাথা নত ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলো।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হ'য়ে এলো।

ফরাশি গুহায় একে-একে সবাই ফিরে এসেছে, কেবলি শুধু ডোনাগান।

বিকেলের ঘটনার জন্তে সকলের খুব মন খারাপ। এমন একটা বিস্ত্রী অবস্থার যে সৃষ্টি হবে, এটা কেউ গোড়ায় ভাবতে পারেনি। বেশ তো হুল্লোড় ক'রে খেলা হচ্ছিলো সবাই মিলে।

রাত আটটার সময় ডোনাগান গুহায় ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে চূপচাপ শুতে গেলো, একটা কথাও বললে না। আর তার ওই গুম হ'য়ে থাকারটাই ব'লে দিলে যে গরডনের উপর শিগ্গিরই সে একটা ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে।

চারম্যান আইল্যাণ্ডে আরেকটা মে মাস এলো।

প্রথম সপ্তাহ থেকেই এমন ঠাণ্ডা পড়তে লাগলো যে, ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলে না-রেখে রাতে ঘুমোনোই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। শীতের প্রকোপ যত বাড়তে থাকে, যাযাবর পাখিরাও ততই ঝাঁকে-ঝাঁকে দ্বীপ ছেড়ে উত্তরের কোনো দেশে উড়ে যেতে থাকে। এদের মধ্যে ছোটো সোয়ালো পাখিগুলোই অনেক দূর-দূর দেশে উড়ে যায়। ত্রিয়ঁ জাল পেতে কতগুলো সোয়ালো পাখি ধ'রে কাগজে তাদের জাহাজডুবির কথা লিখে তাঁজ ক'রে তাদের পায়ে সূতো দিয়ে বেঁধে দিলো—যদি কোনো রকমে একটা পাখিও উত্তর দেশের কাঙ্ক্ষা পড়ে।

শীতের সূচনাতেই দ্বীপবাসীদের মধ্যে আরেকটা উদ্বেজন্য ব্যাপার ঘটলো। গরডনের নেতৃত্বকাল শেষ হবে জুন মাসের ১০ তারিখে—তখন তাদের

নতুন দলপতি নির্বাচন করতে হবে। ত্রিয়্যা আর গরডন—দু'জনেই এ-বিষয়ে খুব উদাসীন। কেবল একজন এই নির্বাচন উপলক্ষে একেবারে উঠে-প'ড়ে লাগলো—সে ডোনাগান। তার একান্ত ইচ্ছে, এবার যেন সে দলপতি নির্বাচিত হয়। কিন্তু আশা তার খুবই কম। তার দলে মাত্র তিনজন—ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। কিন্তু তাই ব'লে সে একেধারে নিরাশ হ'য়ে পড়লো না। তদ্বিরে কী না হয়? ভোটের জুড়ে সে সবার কাছে রীতিমতো তদ্বির শুরু ক'রে দিলে।

শেষে একদিন সেই ১০ই জুন এসে পড়লো। নির্বাচন শুরু হবে সেদিন বিকেলে। ছেলেদের সবাইকে এক টুকরো কাগজে তার মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখে দিতে হবে।

বেলা তিনটের সময় গরডন ভোটের বাক্স খুললো। খুবই গম্ভীরভাবে প্রাথমিক কাজগুলো শেষ ক'রে ভোট গোনা শুরু হ'লো। গুনে দেখা গেলো নির্বাচনের ফল দাঁড়িয়েছে এইরকম :

ত্রিয়্যা ভোট পেয়েছে ৮

ডোনাগান পেয়েছে ৩

গরডন মাত্রই ১

ডোনাগান আর গরডন কাউকে ভোট দেয়নি, ত্রিয়্যা কেবল গরডনকে ভোট দিয়েছিলো।

নির্বাচনের ফল দেখে ত্রিয়্যা নিজেই অবাক। আর ডোনাগান! সে তো রাগে-ক্ষোভে নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ে! ত্রিয়্যা ভেবেছিলো, গরডনই আবার নির্বাচিত হবে, কিন্তু—কী আশ্চর্য—সে ছাড়া আর কেউ গরডনকে ভোট দিলে না! গরডন একটু কষ্ট পেলো—মনে মনে বুঝলো যে তাকে কেউ চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনথারাপ ভাবটা সে ঝেড়ে ফেললে।

ত্রিয়্যা গোড়ায় ভাবলে যে সে নিজে নেতৃত্ব নিয়ে শেষে আবার গরডনকেই নেতৃত্ব দেবে—কারণ সে-ই তো এখন সকলের প্রতিনিধি। কিন্তু এমন সময় তার চোখ পড়লো জাকের উপর। পরক্ষণেই কোনো কথা না ব'লে সে গম্ভীর মুখে গরডনের কাছ থেকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিলে।

ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর

দলপতি হওয়ার পর ত্রিয়ার প্রথম কাজ হ'লো কুনোর উপসাগরে গিয়ে নিশানটির বদলে একটা উড়ো বেলুন টাঙিয়ে দেয়া। নিশানটাকে আর কতদূর থেকেই বা দেখা যাচ্ছে? বেলুনটা বরং সমুদ্রের বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও স্পষ্ট দেখা যাবে। নলখাগড়ার বেত থেকে বুড়ি, আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বেলুনের খোল বানানো হ'লো—আর তাদের অনভ্যস্ত হাত সত্ত্বেও বেলুনটা হ'লো হালকা, মজবুত আর সুদৃশ্য।

ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা পড়েছিলো, এবারে শুরু হ'লো ভয়ংকর শীত। গুহার বাইরে ষাওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সকাল কি মধ্যদিন, বিকেল কি রাত্রি—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনো সময়েই সেই ছ-ছ ঠাণ্ডা কমে না। বাইরে যেতে পারে না ব'লে ছেলেরা গুহার মধ্যে এবার রীতিমতো ইশকুল বসিয়ে দিলো—পড়াশুনোর মন দিলো সবাই। সঙ্গে বইয়ের অভাব ছিলো না। অসুবিধে হ'লে একে অল্পকে জিজ্ঞেস করে নেবারও সুযোগ ছিলো। তা ছাড়া বড়োরা ছোটোদের গল্প ক'রে সব শেখাতো। গল্পের ছলে জানাতো ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিজ্ঞান-কাহিনী, আরো কত কী। এইভাবেই আগস্ট মাস শেষ হ'লো। ঠাণ্ডা আস্তে-আস্তে ক'মে আসছে বটে, তবু এখনও বরফ পড়ে বাইরে।

ঠাণ্ডা সেদিন অল্পদিনের চেয়ে অনেকটাই কম ছিলো। বাইরের মাঠ, বন, নদী—চারদিক বরফে ধবধব করছে। যেন কোনো শুভ্র, মসৃণ, নিরেট চাদরে জলহল কেউ মুড়ে রেখেছে।

ঠাণ্ডা কম দেখেই ত্রিয়ার ঠিক করলে, সবাইকে নিয়ে বাইরে বরফের উপর একটু স্কেটিং করতে বেরবে। গুহার মধ্যে আটকা থেকে তারা সবাই একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

গত বছর শীতের সময়েই তারা সকলে অল্পবিস্তর স্কেট করা শিখেছিলো—কারণ স্কেটিং-এর সব সাজসরঞ্জামই ছিলো জাহাজে—বাকিটা তো চর্চা, অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আয়ত্তে আসে। কিন্তু স্কেট করার ওস্তাদ বলতে ছিলো মাত্র তিন জন—ডোনাগান, ক্রস আর জাক। আর এই তিন জনের মধ্যে আবার সেরা ছিলো জাক।

অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের কী কুর্তি ! বিশেষ ক'রে যারা ভালো স্কেট করতে পারে, তাদের মন তো এই খেলা মাঠভরা বরফ দেখে উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো। স্কেট করতে-করতে মেরা তিনজনে হয়তো শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু কুয়াশা যে-রকম নিবিড় হ'য়ে আছে, তাতে দিনের বেলাতেই সব কেমন ঝাপসা ছায়াঢাকা দেখাচ্ছে—এই আবছায়ার মধ্যে বেশি দূরে যাওয়াটা আদৌ নিরাপদ নয়। অঙ্ককারে পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে—আর পথ হারিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে তো তফুনি ডবল-নিউমোনিয়া। তার উপরে আবার শীতকালের আমিষখোর জঙ্কগুলো বেরোলে তো আর রক্ষা নেই—জানোয়ারের কবলে গিয়ে পড়লে ইষ্টনাম স্বরণ করা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। তাই ত্রিয়ার সবাইকে পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিলে, কেউ যেন বেশি দূরে না-যায়। বললে, 'খুব-একটা দূরে যাবার চেষ্টা ক'রো না কিন্তু কেউ। আর সবাই পরস্পরের কাছাকাছি থেকে—অন্তত লক্ষ্যের মধ্যে থেকে। আমি আর গরডন তোমাদের জন্মে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।'

মহোৎসাহে স্কেটিং শুরু করলে সকলে। কেউ-বা ছু-পা গিয়েই খেলো আছাড়, কেউ-বা আবার খানিকটা গিয়েই প'ড়ে গেলো পা পিছলে। কিন্তু তাতে এরা মোটেই দমে যাবার পাত্র নয়। সবাই হাসতে-হাসতে কোলাহল করতে-করতে দূর থেকে দূরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সবচেয়ে সুন্দর চললো জাক। সাবলীল তার স্কেট করার ভঙ্গি, লাভণ্যময় ও ব্যক্তিব্যঞ্জক। এতটুকু চেষ্টা বা আয়াসের চিহ্ন নেই তার স্কেট করায়—ভারি সুন্দর দেখায় যখন নানাভাবে সব বাধা অতিক্রম ক'রে সে যেতে থাকে। কখনও এক পায়ে, কখনও দু-পায়েই, কখনও সোজা হ'য়ে, কখনও বা ঝুঁকে প'ড়ে, আবার কখনও-বা লাটুর মতো পাক খেতে-খেতে সে আশ্চর্য সুন্দরভাবে সকলের আগে-আগে চললো।

ক্রমে অনেক দূরে চ'লে এলো জাক, ডোনাগান আর ক্রস। দলের অন্য সবাই তখন অনেক পিছিয়ে প'ড়ে।

হঠাৎ ডোনাগান পরামর্শ দিলে, 'চলো, আমরা আরো ওদিকে যাই—ওদিকে অনেক বুনোহাঁসের বাসা আছে।'

ক্রস উত্তর দিলো, 'না, বড় অঙ্ককার! শেষে কি জানোয়ারের মুখে পড়বো?'

'আসল কথাটা বললেই হয়!' আঁতে যা দেবার চেষ্টা করলে ডোনাগান : 'এটা সোজা স্তম্ভি বললেই হয় যে তোমার আসলে ত্রিয়ার কেই ভয়?'

এ-কথার উপর ক্রম বেচারি আর কী করে ? ডোনাগানের সঙ্গেই এগিয়ে চললো বিনা বাক্যব্যয়ে। দেখতে-দেখতে তারা আরো দূরে গিয়ে পড়লো। ততক্ষণে কুয়াশা আরো ঘন হ'য়ে এসেছে, অন্ধকার ক'রে এসেছে চারদিক। মাথার উপরে হাঁসের ডাক শোনা যায়, কিন্তু কুয়াশার জন্ম কিছুই চোখে পড়ে না। এ ঘন তাদের চেনা নীলোজ্জ্বল রৌদ্রময় চারম্যান 'আইল্যাও নয়— এ ঘন এক আলাদা কুয়াশার দেশ।

ত্রিয়ঁ আর গরডন দাঁড়িয়ে তাদের জন্তে অপেক্ষা করছিলো গুহার সামনে। বেলা তিনটের পর থেকে কুয়াশা ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে—শেষে এমন অন্ধকার ক'রে এলো যে পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তারা একে-অন্যকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিলো না। সব কী রকম ঝাপসা, বিবর্ণ আবছায়া হ'য়ে আসছে।

চিন্তিতভাবে ত্রিয়ঁ বললে, যা আশঙ্কা করেছিলুম, তা-ই হ'লো। এখন ছেলেরা কী ক'রে পথ চিনে ফিরবে ?

'তোমার শিঙাটা একবার বাজিয়ে ছাখো না,' গরডন পরামর্শ দিলে, 'শিঙার শব্দ শুনেই ওরা সবাই ফিরে আসবে।'

কোনো কথা না-ব'লে ত্রিয়ঁ পর-পর তিনবার তার শিঙায় ফুঁ দিলো। সেই ঠাণ্ডা, কঠিন কুয়াশাস্তীর্ণ বরফের দেশে শিঙার আওয়াজ শোনালো কোনো প্রেতের চীৎকারের মতো।

দশ মিনিটের মধ্যেই একে-একে সবাই ফিরে এলো—জাক শুকু, শুধু ডোনাগান আর ক্রসেরই কোনো দেখা নেই। বার-বার শিঙায় ফুঁ দিয়েও কোনো ফল হ'লো না। এদিকে বেলা গড়িয়ে আসছে, সন্ধ্যা আসন্ন। শীতকালে একে এমনিতেই তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়, তার উপর আজ আবার এই কুয়াশা।

শেষকালে গরডন বললে, 'এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে একজন এখুনি শিঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক। বাজাতে-বাজাতে গেলেই তারা শুনতে পাবে। এখন হয়তো দূরে গিয়ে পড়েছে ব'লেই শুনতে পাচ্ছে না।

গরডনের কথা শুনেই বাস্কাটার লাফিয়ে উঠলো, 'আমি যাচ্ছি।'

সারভিস বললে, 'উহ, আমি যাবো।'

উইলকল্প বললে, 'বরং আমিই যাই।'

গগুগোল দেখে ত্রিয়ঁ বললে, 'কাউকে যেতে হবে না—আমি নিজেই যাবো।'

তখন জাক বললে, 'তুমি কেন যাবে ? আমি যাচ্ছি। আমার মতো জোরে স্কেটিং ক'রে যেতে পারবে না।'

গরডন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, 'হ্যা, জাকই এ-কাজে সবচেয়ে যোগ্য—
ওই বরং যাক ।'

'বেশ,' বললে ত্রিয়ঁা, 'কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যাবি, আর সারা পথ শিঙা
বাজাবি । তারপর ওদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলোই ওদের ডেকে আনবি ।'

পরমুহূর্তেই জাক সেই নিবিড় কুয়াশার মধ্যে অদৃশ হ'য়ে গেলো ।

ওদিকে অঙ্কার যেন ওই বরফের মতোই ক্রমশঃ নিরেট হ'য়ে উঠছে—
এত জমাট বেঁধে উঠেছে যে মনে হয় হাত দিলে যেন ছোঁয়া যাবে । জাকের
শিঙার আওয়াজও এখন আর শোনা যায় না । ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা
কেটে গেছে । তিন জনের মধ্যে কারুই কোনো পাত্তা নেই ।

উদ্বেগে মাথা নেড়ে ত্রিয়ঁা বললে, 'না, আর অপেক্ষা করা যায় না ।
গরডন, তুমি বরং এক কাজ করো—শিগগির একটা কামান ছুঁড়ে কাঁকা
আওয়াজ করো—কামানের শব্দ অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছবে ।'

ফরাশি গুহার ছয়ারের ছু-পাশে দুটো পেতলের কামান বসানো ছিলো—
ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে তাদের মুখ বাইরে বেরিয়ে এসেছে । তারই একটা
কামানে বারুদ ভ'রে তক্ষুনি বাক্সটার কম্পিত হাতে তাতে আগুন দিলে ।

সেই কুয়াশা-ঢাকা থমথমে ঠাণ্ডা অঙ্কারে বজ্রের মতো দারুণ শব্দে কামান
গর্জন ক'রে উঠলো । আর যেহেতু তাদের উদ্বেগের মধ্যে অমন প্রচণ্ড শব্দে
কামান গর্জন করলো, তাই তারা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো কেন যেন । কম
ক'রেও দশ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে এই শব্দ । কিন্তু দশ মিনিট কেটে
গেলো, তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়া এলো না । তখন আবার কামান
ছোঁড়া হ'লো, কিন্তু তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই । আরো-
কিছুক্ষণের মধ্যে পর-পর দু-বার কামান ছুঁড়লো ছেলেরা । আর তার পরেই
হঠাৎ অনেক দূর থেকে যেন দু-তিনটে বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো ।

শুনেই সারভিস দিলো এক তিড়িং লাফ । 'ওই যে গুলির আওয়াজ !
যাক—বাঁচা গেলো । যা ভাবনায় ফেলেছিলো এরা !'

তক্ষুনি একটা কাঁকা আওয়াজ ক'রে বাক্সটার তার উত্তর দিলে । এবারে
পূর্ব দিক থেকে আবার বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো—শব্দটা এবার বেশ কাছে
থেকেই এলো ব'লে মনে হ'লো ।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেলো দুটি ছায়ারূপি তীরবেগে তাদের দিকে স্বেটিং
ক'রে আসছে । ওকি ! ও যে কেবল ডোনাগান আর ক্রস ! জাক তো সন্দেহ
নেই ! জাককে নাকি তারা চাখেওনি ।

ত্রিয়ঁ দৃঢ় স্বরে বললে, 'আমি চললুম, গরডন। যদি জাককে পাই তবেই ফিরবো—নইলে আর আমাদের দেখা হবে না।'

অনেক কষ্টে শেষটার ত্রিয়ঁকে খামালো গরডন আর বাস্কার।

আরো কয়েকবার তোপ দেগেও কোনো ফল হ'লো না দেখে একরাশ শুকনো পাতা, কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন জালাবার ব্যবস্থা করা হ'লো— অন্ধকারে দূর থেকে আগুন চোখে পড়বে সহজেই। কুয়াশাও যেন হঠাৎ এরই মধ্যে একটু পাতলা হ'য়ে এসেছে।

সকলে যখন আগুন জালাবার কাজে ব্যস্ত, তখন গরডন হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'ত্রিয়ঁ! দূরে—ওই-যে—আবছা ছায়ার মতো কী একটা ন'ড়ে বেড়াচ্ছে!'

ছেলেরা তাকিয়ে দেখলে, দূরে অনেক দূরে, হৃদের ধার থেকে একটি ছায়ামূর্তি তীরের মতো গুহার দিকে ছুটে আসছে।

নিশ্চয়ই জাক!

সবাই প্রাণপণে ট্যাচামেচি ক'রে জাককে ডাকতে লাগলো।

উদ্ধার মতো বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং ক'রে আসছে জাক, পায়ের অদ্ভুত ক্ষিপ্ততা, সারা গায়ে যেন পাখির লঘুতা।

ত্রিয়ঁ হুরবিন চোখে লাগিয়ে একদৃষ্টে জাকের দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ সে ভয়ানক কণ্ঠে চৈচিয়ে উঠলো, 'গরডন! জ্বাখো-জ্বাখো! জাকের পিছনে আরো ছোটো লোক ছুটে আসছে! কারা ওরা?'

'কই লোক?' বাস্কার আতর্জনাদ করলো, 'ও যে ছোটো ভীষণ জাগুয়ার জাককে তাড়া ক'রে আসছে!'

ততক্ষণে কিন্তু সবাই বেশ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে : মানুষও নয়, জাগুয়ারও নয়—ছোটো প্রকাণ্ড ভালুক জাককে ধরবার জন্তে তার পিছন-পিছন ছুটে আসছে। সেই হিংস্র ক্ষুধার্ত ভয়ংকর ভালুকের হাতে পড়লে আর রেহাই নেই জাকের, নিমেষের মধ্যে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে।

তখনও গুহা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রয়েছে জাক।

ডোনাগান কোনো কথা না-ব'লে ধুক-ধেকে-ছিটকে-বেরোনো তীরের মতো জাকের দিকে ছুটে গেলো : পায়ের স্কেটিং-এর জুতো, হাতে বন্দুক। সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই ভালুকছোটোকে লক্ষ্য ক'রে পর-পর দুটি গুলি ছুঁড়লে সে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। গুলি খেয়ে ভালুকছোটির গায়ে যদিও আচড়টিও পড়লো না, তবু তারা তখনই হৃদের দিকে ছুটে পালালো।

ভালুক দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। চারম্যান আইল্যাও তবে
ঝক্কুলের বাসস্থল !

গুহার ফেরবার সময় জাক নিচু গলায় তার দাদাকে বললে, 'আমাকে
একটা সুযোগ দেয়ার জন্তে তোমাকে ধন্যবাদ।

নীরবে ত্রিয়'। তার হাতটা একটু চেপে ধরলে, তারপর ডোনাগানের দিকে
ফিরে তাকিয়ে বললে, 'ডোনাগান, তোমার অবাধ্যতার জন্তেই আজ এমন
কাণ্ডটা হ'লো। নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি দল ছেড়ে এত দূরে গিয়েছিলে ?
কিন্তু তাহ'লেও আজ তুমি যে-সাঁহস, উপস্থিত বুদ্ধি আর মনের জোর দেখিয়েছো,
সেজন্তে তোমাকে অশেষ অন্তবাদ।'

'আমি কেবল আমার কর্তব্য করেছি,' ঠাণ্ডা গলায় এই কথা ব'লে
ডোনাগান ত্রিয়'র প্রসারিত উৎসুক হাতকে উপেক্ষা ক'রে গম্ভীর মুখে গুহার
গিয়ে ঢুকলো।

বিচ্ছেদ

ওই ঘটনার পর প্রায় দেড়মাস কেটে গেছে।

তেমন ঠাণ্ডা আর নেই, শীতকাল অপস্রয়মান। হ্রদ আর নদীর সমস্ত বরফ
গ'লে গিয়েছে। মাটির উপরও বরফের আর-কোনো চিহ্ন নেই।

সেদিন ১০ই অক্টোবর।

চারম্যান আইল্যাওর চারটি ছেলে হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে ক্যামিলি
লেকের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই দেখা গেলো, একটা গাছের
নিচে আগুন জালিয়ে গোল হ'য়ে ব'সে তারা ছোটো বালি হাঁস ঝলশাতে শুরু
ক'রে দিয়েছে। বোধহয় আসার সময় তারা এই পাখিছটি শিকার করেছিলো।
পরম তৃপ্তির সঙ্গে পোড়া মাংস খেয়ে তিনজনে কঞ্চল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো,
চতুর্থ ছেলেটি ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগলো।

ফরাশি গুহা থেকে এত দূরে এসে রাত কাটাচ্ছে কেন এরা ? কেন
এসেছে ? ছেলে চারটিই বা কে-কে ?

তারা আর কেউ নয়—ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকস। আলাদা-
ভাবে থাকার জন্তেই তারা ফরাশি গুহা ছেড়ে চ'লে এসেছে।

সম্প্রতি ত্রিয়ঁ আর ডোনাগানের মধ্যে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধতো। ত্রিয়ঁ এখন দলপতি—তার নির্দেশ মেনে চলাটা স্বাধীনচেতা ডোনাগানের কাছে ক্রমশই অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো। ইদানীং সে যেন ইচ্ছে ক'রেই ত্রিয়ঁকে পদে পদে অবহেলা ক'রে চলতো। ত্রিয়ঁ সুযোগ পেলেই ডোনাগানকে তিরস্কার করতে ছাড়তো না। শেষকালে এমন অবস্থা হ'য়ে উঠলো যে আর তাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো।

একদিন ত্রিয়ঁ গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগেস করেছিলো, 'ওরা রাতদিন অত কি ফিশফিশ করছে? সব সময়েই তো দেখছি কী যেন ঘোঁট পাকাচ্ছে বারজনে।'

গরডন উত্তর দিয়েছিলো, 'বোধ হয় ওরা চারজনে আলাদা হ'য়ে যাবার মতলব আঁটছে।'

'আলাদা হ'য়ে যাবে? কেন? ফরাশি গুহায় ওরা থাকবে না আর?' ত্রিয়ঁ একেবারে স্তম্ভিত। 'আলাদা হ'য়ে গিয়ে ওরা থাকবে কোথায়?'

'তা জানি নে। তবে একদিন দেখলুম উইলকম্ব বদোয়ঁার ম্যাপটার একটা নকল ক'রে নিচ্ছে।'

'বদোয়ঁার ম্যাপটা নকল ক'রে নিচ্ছিলো?' বলেছিলো ত্রিয়ঁ, 'তাহ'লে হয়তো সত্যিই ওরা আলাদা হবার আয়োজন করছে। কিন্তু...আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, গরডন? ডোনাগানকেই তোমরা নেতা ক'রে নাও, আমি না-হয় পদত্যাগ করছি। ওরা যদি আলাদা হ'য়ে যায়, তাহ'লে ছোটোদের মধ্যে তার একটা বিক্রী প্রতিক্রিয়া হবে। তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করাটা বোধ করি অনেক ভালো।'

'না, তা হয় না। অবস্থা ষে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে বরং ওদের আলাদা হওয়াই ভালো। বরং একসঙ্গে থেকে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধলে ছোটোদের উপর তার প্রতিক্রিয়া আরো ধারাপ হবে, সকলের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়বে।'

যা তারা আন্দাজ করেছিলো, তা-ই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য হ'লো। শীত চ'লে যেতেই, ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় খেতে ব'সে খাবার-টেবিলেই ডোনাগান কথটা উত্থাপন করেছিলো: 'ত্রিয়ঁ, কাল থেকে আমি, ক্রস, ওয়েব আর উইলকম্ব—এই চার জনে আলাদা থাকবো।'

ত্রিয়ঁ জানতো একদিন না একদিন কথটা ডোনাগান পাড়বেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা শুনে সে যেন কিরকম অসহায় বোধ করছিলো। একটু চূপ

ক'রে থেকে শেষে বলেছিলো, 'তোমরা কি আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ডোনাগান ?'

'না ব্রিয়ঁ, ত্যাগ করছি নে। তবে আমরা চারজনে আর এখানে থাকবো না, স্বীপের অন্য কোনখানে গিয়ে আশ্রয় নেবো।'

'কেন ? কীসের জন্তে তোমরা এই ব্যবস্থা করেছো ?'

'তোমার কি এখনও কোনো খটকা আছে, ব্রিয়ঁ ? কারণ তো তুমি ভালো ক'রেই জানো। আমরা আমাদের খুশিমতো থাকতে চাই। কারু হুকুম মেনে চলা আমার সহ হয় না।'

'আমি কি তোমাদের হুকুম করি ? সত্যি, আমার ব্যবহারে তেমন কোনো দোষ দেখেছো, ডোনাগান ?'

'দোষ হয়তো আমাদের দু-তরফেরই, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হ'লো এই যে তুমি স্বীপের দলপতি।'

ব্রিয়ঁ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলো, 'বেশ, তোমরা যদি আলাদা হ'য়ে যেতে চাও তো আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমাদের ভাগের সমস্ত জিনিশ চাই। উইলকক্স সব জিনিশের একটা তালিকা করেছে—তা থেকে ভাগ ক'রে আমাদের অংশগুলো আমরা নিয়ে নেবো।'

'তা নেবে বই কি, নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু তোমরা যাচ্ছে কবে ?'

'কালই,' উত্তর দিয়েছিলো ডোনাগান, 'একবার যখন মতিস্থির ক'রে ফেলেছি, তখন আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

ব্রিয়ঁ যখন ফ্যামিলি লেকের ওপারে গিয়ে সমস্ত দেখে শুনে ফিরে এসেছিলো, তখন সে ইস্ট-রিভারের মোহানার কাছে সমুদ্রতীরের সেই সুন্দর গহ্বরগুলির গল্পও করেছিলো। এ-কথাও সে তখন বলেছিলো, ভবিষ্যতে কখনও কোনো দরকার হ'লে ফরাশি গুহার বাস তুলে দিয়ে সেই গহ্বরগুলোর মধ্যেই আস্তানা পাতে পারবে তারা। ইস্ট-রিভারের জল খুব মিষ্টি, নদীর দু-তীরে গভীর বন, বনের মধ্যে অসংখ্য পাখি আর জীবজন্তু। এই সমস্ত শুনে ডোনাগান তখনই মনে-মনে ঠিক করেছিলো, সুবিধে হ'লেই তারা হ্রদের ওদিকে গিয়ে বাসা করবে।

সেইজন্টেই এখন সেই গহ্বরের এই বনের মধ্যে তাদের দেখা গেলো— তিনজনে ঘুমোচ্ছে, আর ডোনাগান আগুনের ধারে ব'সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে গালে হাত দিয়ে, পাহারা দিতে-দিতে আকাশ পাতাল কত কী

ভাবছে যেন সে। একটু পরেই উইলকম্বকে তুলে দিয়ে পাহারা দিতে ব'লে সে নিজেও চিৎপাত হ'য়ে পড়বে। এমনি পালা ক'রে এক-একজনে পাহারা দেবে সারা রাত।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই চারজনে যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলো— তাদের রাজিবাসের চিহ্ন হিসেবে গাছতলায় প'ড়ে রইলো কেবল কিছু পোড়া কাঠ, ছাই আর মাংসের হাড়গোড়।

তখনও ভালো ক'রে সূর্য গুঠেনি, আশুনের কুণ্ডের মধ্য থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে তখনও। ডোনাগান বন্ধুদের বললে, 'চারম্যান আই-ল্যান্ডের এই পূর্ব-এলাকাতেই আমাদের থাকা উচিত। আমার মনে হয় আমেরিকা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ম্যাগেলান প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে-সব জাহাজ পেরু আর চিলির বন্দরে চলাফেরা করে, তারা এই পূর্ব দিক দিয়েই যাবে। একদিন না একদিন কোনো জাহাজ আমাদের চোখে পড়বেই। সেইজন্মে আমরা এই ডিসেম্পশন বে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।'

ডোনাগান ভাবতে লাগলো, তাদের জাহাজটা যদি এখানে এসে উঠতো, তাহ'লেই সবদিক দিয়ে ভালো হ'তো। সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অসংখ্য গহ্বর। সেই পাহাড়গুলির পর থেকেই শুরু হয়েছে ঘন নিবিড় অরণ্যের বিস্তার।

চারদিক দেখে-শুনে ডোনাগান শেষটায় নদীর ধারের একটা গুহাই থাকার জন্মে পছন্দ করলে। গুহার দেয়াল শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝের উপর হলদে রঙের মিহি বালি। এই গুহাটি হবে তাদের 'লিভিং রুম', আশপাশের অন্যান্য গহ্বরও তারা নানা কাজে ব্যবহার করবে। পাহাড়টার আকৃতি দেখে তারা তার নাম রাখলে 'রিয়ার্লক হারবার'।

পরের দিন তারা সমুদ্রতীর ধ'রে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিকটা ঘুরে দেখবে ব'লে ঠিক করলে। খুব ভোরবেলাতেই রওনা হ'য়ে পড়লো চারজনে। প্রথম মাইল-তিনেক পথ কেবল পাথর-ছাওয়া। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের সারি পেরুতেই বেলা ছুপুর হ'য়ে গেলো। এবার পথে পড়লো ছোট্ট একটি খালের মতো নদী—তারা তার নাম রাখলো 'নর্থ-ক্রীক'।

বেলা তিনটের সময় তারা খুব ক্লান্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সে জিরোবার আয়োজন করছে, হঠাৎ কী দেখে ক্রম চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ডোনাগান, চাখো-চাখো, ওটা কী ন'ড়ে বেড়াচ্ছে ?'

সকলে তাকিয়ে আছে, কাছেই, বনের মধ্যে একটা অদ্ভুত চেহারার জন্তু গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখনই বন্দুক হাতে তারা সেদিকে ছুটে গেলো। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে গিয়ে যখন ভালো ক'রে তারা জন্তুটিকে লক্ষ্য করলে, তখন ভয়ে কাঁঠ হ'য়ে গেলো একেবারে। একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার নদীতীরের ঘোপঝাড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

একটুকু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা ঠিক ক'রে নিলো কী করা উচিত। তারপর সাহস সঞ্চয় ক'রে চারজনেই একসঙ্গে তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো। জন্তুটার গায়ে চার-চারটে গুলি লাগা সত্ত্বেও সে ছড়মুড় ক'রে গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। জন্তুটা যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন ডোনাগান তাকে চিনতে পারলে। আসলে সেটা গণ্ডার নয়, একটা প্রকাণ্ড ট্যাপির। দক্ষিণ আমেরিকার নদীতীরেই এইসব জন্তুকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়।

তাদের অসুস্থকান চললো পরদিনেও। সেদিনও সূর্যোদয়ের আগেই তারা আবার সমুদ্রতীর ধ'রে এগুতে লাগলো। আকাশটা আবার হঠাৎ মেঘলা হ'য়ে গেছে। বেলা আটটা বেজে গেলো, তবু সূর্যের দেখা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

হঠাৎ দেখতে-দেখতে সারা আকাশ মেঘে কালো হ'য়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো প্রচণ্ড ঝড়। গতাস্তর না দেখে তারা ফিরে যাবার উদ্ভোগ করলে। কিন্তু সেই দারুণ ঝড়ের মধ্যে কত জোরেই বা তারা যেতে পারে? তবু হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে তারা আস্তানার উদ্দেশ্যে এগুতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে এলো ঝড়ের মধ্যে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার ঝড়ের সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের হানাহানিও শুরু হ'য়ে গেলো। ওদিকে চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। কালো অন্ধকারের গায়ে যেন কালো সমুদ্র একেবারে লেপ্টে দিয়েছে—কেবল কোনো অতিকায় আহত জন্তুর মতো আক্রোশে ফুঁশছে সমুদ্রের জল, আর সেই শব্দ থেকেই তারা বুঝতে পারলে সমুদ্র কোথায়। কোনোমতে সেই উপলব্ধির বেলাসুমির উপর দিয়ে তারা এগুতে লাগলো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই সমুদ্রতীরে কী-একটা প্রকাণ্ড কালো জিনিস দেখে উইলকিন্স আতঙ্কিত চীৎকার ক'রে উঠলো। কী যেন একটা বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রজল থেকে উঠে আসছে সেই ঝড়ের মধ্যে—যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই বিস্ময়িকা।

দৃশ্যটা দেখে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে পাথরের স্মৃতির মতো তারা দাঁড়িয়ে রইলো।

আর রকে নেই, এইবারে জন্তুটা তাদের আক্রমণ করবে। বিদ্যুতের আলোর পলকের মধ্যে সেই বিভীষিকাকে তারা দেখে নিয়েছে...

পরক্ষণেই আবার আকাশ কেঁড়ে বাঁকা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেলো। কই, জন্তুটা তো ঠিক একই জায়গায় প'ড়ে আছে—একটুও নড়েনি! কী ওটা তাহ'লে? সত্যি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জন্তু, না অন্য কিছু? এক পলক দেখেছে, কিন্তু তাতেই ডোনাগানের মনে হয়েছে সেটা যেন একটা বড়ো নৌকো।

রাত তখন প্রায় নটা। বাজ ভীষণ গরজাচ্ছে মাথার উপর, আশেপাশে গাছপালাগুলো যেন মাটির বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার জন্তু হওয়ার মতো ছটফট করছে।

ভয়ে-ভয়ে সংশয়বাকুল মনে তারা কালো জ্বনিশটার দিকে একটু এগিয়ে গেলো।

সত্যিই তো! একটা নৌকোই তো বটে!

কিন্তু কোনো জনহীন দ্বীপে সমুদ্রতীরে এমন জায়গায় নৌকো এলো কোথেকে? যে-রকম ঝড় উঠেছে, তাতে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোনো জাহাজ-ডুবি হয়েছে—না-হ'লে হঠাৎ এখানে এমন সময় নৌকো আসবে কোথা থেকে?

ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই তারা নৌকোটির দিকে এগলো।

কাছে যখন এসেছে, তখন হঠাৎ ভীষণ শব্দ ক'রে বাজ ফাটলো কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝিলিক, আবার বাজের আওয়াজ।

সেই বাঁকাচোরা আলোর ঝিলিকের মধ্যে যে-নতুন দৃশ্য তারা দেখতে পেলো, তাতে চারজনেই একসঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো।

সে কী বীভৎস, ভয়াবহ দৃশ্য!

বিদ্যুতের আলোর তারা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, নৌকোর পাশে ছুটি চিংপাত মনুষ্যদেহ প'ড়ে আছে—তাদের কারু দেহেই প্রাণ নেই।

আক্রমণ

একে অমন ঝড়, তায় ক্লাস্ত অবসন্ন ও ভীত-চকিত হ'য়ে আছে সবাই, উপরন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ দৃশ্য! নিজেদের অজান্তেই তারা চীৎকার ক'রে সবেগে পিছন ফিরে ছুট দিলে।

আর পিছন ফিরতেই আকাশ যেন বজ্র হ'য়ে মাথার উপর ভেঙে পড়লো। আর্ত ছেলেরা হাত-ধরাধরি ক'রে ঝড়ের মধ্যে সবেগে ছুটতে লাগলো। সারা রাত যে কেমন ক'রে কাটলো, সেদিকে কোনো হ'শ রইলো না তাদের। কেমন একটা থমথমে ঘোরের মধ্যে কলের মতো তারা যেন ছুটে যাচ্ছে।

ততক্ষণে আন্তে আন্তে ঝড় থেমে আসছে, মেঘ কেটে যাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভোরবেলাকার ময়লা মেঘ-ঢাকা আলো। এবার তাদের আশ্তানার দিকে ফেরা উচিত। কিন্তু দিনের আলোয় একটু সাহস ফিরে পেয়েছে তারা—সেই চমকটাও আর নেই। তাই তারা ঠিক করলে যাবার আগে সেই মৃত লোক-দুটির সদৃশতার একটা ব্যবস্থা ক'রে যাবে।

হাওয়ার ঝাপটা তখনও খানিকটা আছে। বহুকষ্টে সেই ভীষণ হাওয়ার মধ্যেই তারা একটু-একটু ক'রে এগিয়ে সেই নৌকোর কাছে এসে দাঁড়ালে।

সেখানে তাদের জন্তে আবারও একটা চমক অপেক্ষা ক'রে ছিলো।

আশ্চর্য! নৌকোটা ঠিক তেমনি প'ড়ে আছে, কিন্তু সেই মৃতদেহদুটি গেলো কোথায়? আশেপাশে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা মৃতদেহদুটির কোনো সন্ধান পেলো না।

'তবে কি লোকদুটি বেঁচে ছিলো, আমরা ভুল ভেবেছিলুম!' জিগেস করলে উইলকন্স, তবে কি তারা কেবল জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে ছিলো, এখন জ্ঞান ফিরতেই উঠে চ'লে গেছে?'

'কিন্তু আমরা চারজনেই একসঙ্গে ভুল করবো, এটা কি সম্ভব?' ডোনাগান বললে, 'নিশ্চয়ই তারা ওই সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে—আদৌ বেঁচে ছিলো না।' এই ব'লে সে পকেট থেকে ছুরবীন বার ক'রে সমুদ্রের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু না, মৃতদেহদুটিকে কোথাও ভাসতে দেখা গেলো না।

এদিক-ওদিক গিয়ে আরো খানিকটা খুঁজে দেখলো তারা, কিন্তু কোথাও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো সন্ধান মিললো না।

ডেনাগান মুখে বলেছে বটে তাদের ভুল হয়নি, কিন্তু তার মনেও সংশয় ছিলো। বিষয়, সন্দেহ-জাগা মনে তারা আবার নৌকোর কাছে ফিরে এলো। নৌকোর মধ্যেও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকোটা, অত্যন্ত মজবুত ; কোনো জাহাজের নৌকো ছিলো সম্ভবত। কিন্তু মজবুত হ'লে কী হবে, এখন আর সেটা আদৌ ব্যবহার-যোগ্য নেই, ডুবোপাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নৌকোর ভিতরে আছে কিছু ছেঁড়া পাল, আর কয়েকগাছা মোটা দড়ি। নৌকোর একপাশে একটা পেতলের ফলকের উপর ইংরেজিতে লেখা :

‘সেভার্ন—সানফ্রান্সিস্কো।’

সানফ্রান্সিস্কো! ক্যালিফোর্নিয়ার সেই বিখ্যাত বন্দর সানফ্রান্সিস্কো! তাহ'লে এই নৌকোটা যে-জাহাজের ছিলো, সেটা মার্কিন জাহাজ!

কিন্তু সেই নিঃসীম সমুদ্রে নীল জল আর ফেনা ছাড়া আর-কিছু দেখা গেলো না। দিগন্ত অবধি কেবল ঢেউ, ফেনা আর নীল জল। কোনো জাহাজের পাল দেখা গেলো না কোথাও।

ডেনাগান তার দলবল নিয়ে ফরাশি গুহা ছেড়ে ষাবার পর থেকে ত্রিয়ার মন ভারি খারাপ হ'য়ে আছে। গরডন অবিশ্রি সব সময়েই তাকে সাস্থনা দেবার চেষ্টা করছে : ‘অত মন খারাপ করছ কেন, ত্রিয়ারী? তোমার দোষ কী? তাছাড়া—আমি বলছি—ওরা শিগ্গিরই ফিরে আসবে। বর্ষা একবার নামুক না, তখনই বাছাধনেরা মুখ কালো ক'রে আবার এসে এই ফরাশি গুহাতেই উঠবে।’

কিন্তু সাস্থনার তার উষেগ মোটেই কমে না। তাছাড়া দ্বীপ থেকে উদ্ধারের ভাবনাতেও সে অস্থির হ'য়ে আছে। দলে ভাঙন ধরেছে, ছেলেদেরও এবার বেশ ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছে—নতুন-নতুন বেশ মজা লেগেছিলো, কিন্তু এখন আর সে মজা নেই। আর কিছুদিন দ্বীপে থাকলেই ছেলেদের মনের উপর একটা বিষম প্রতিক্রিয়া হবে। ‘রবিনসন ক্রুসো’রও দ্বীপে শেষটার খারাপ লাগতো। আর ইয়োহান স্ক্রিগ বাই লিখুন না কেন, হাইন্ডারল্যাণ্ডের রবিনসন-পরিবারেরও শেষ দিকটার দ্বীপে থাকতে সত্যি কি খুব মজা লাগতো?

ত্রিয়ঁ। ভাবলে, শূন্যে যেখানে তারা বেলুন উড়িয়ে রেখেছে, সেখানে একটি অতিকায় ঘুড়ি উড়িয়ে রাখতে পারলে কেমন হয় ! সমুদ্রের ধারে সব সময়ই জোরালো হাওয়া থাকবে, দড়িরও কোনো অভাব নেই, তেমন উঁচুতে ওড়াতে পারলে আরো অনেক মাইল দূর থেকেই তা দেখা যাবে ।

বনের বেত আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে দেখতে-দেখতে এক মস্ত ঘুড়ি বানানো হ'লো । ঠিক হ'লো পরদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানো হবে । কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠলো । ষে-ঝড় ডোনাগানদের মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিলো, এটা সেই ঝড় । কাজেই সেদিন আর ফরাশি গুহা থেকে ঘুড়িটাকে বার করাই গেলো না । তার পরদিনও বেশ ঝড়বুষ্টি চললো । শেষে শুক্রবারে ঝড় থামলো । ত্রিয়ঁ। ঠিক করলো, সেদিন দুপুরবেলাতেই সে ঘুড়ি ওড়াবে । রোদ উঠেছে দুদিন পরে, হাওয়াতেও বেশ টান আছে, ওই অতিকায় ঘুড়ি সহজেই উড়বে । তারপর সন্ধ্যাবেলায় ঘুড়ি নামিয়ে তার ল্যাজে একটা লঠন জালিয়ে ঝুলিয়ে দেবে । তাহ'লে রাতের বেলাতেও অনেক দূর থেকে সেই আলো দেখা যাবে !

বেলা একটার সময়ে বাস্কাটার আর গরডন ধরাধরি ক'রে সেই অতিকায় ঘুড়িটাকে তুলে ধরলে । জাহাজের একটা ছইলের সঙ্গে ঘুড়ির স্তো জড়িয়ে ছইলটাকে মাটিতে এঁটে দেয়া হয়েছিলো । ত্রিয়ঁ। সেই ছইলের পাশে স্তো হাতে দাঁড়ালো । তার সংকেত পেলে বাস্কাটার আর গরডন ঘুড়ি ছেড়ে দেবে । দু-পাশে বাকি ছেলেরা সবাই রুদ্ধ কৌতুহলে দাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু ত্রিয়ঁ।র আর সংকেত করা হ'লো না ।

ফ্যানও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ড দেখছিলো—হঠাৎ সে পিছন ফিরে ভীষণ চীৎকার করতে-করতে তীরের মতো পাশের জঞ্জলের দিকে ছুটে গেলো ।

তখনই বন্দুক নিয়ে ত্রিয়ঁ। আর গরডনরা কম্পিত পায়ে বনের দিকে অগ্রসর হ'লো । গিয়ে ছাখে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের শৃড়ির উপর ফ্যান সমুখের দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে, আর গাছের তলার প'ড়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা—পোশাক দেখে তাঁকে ইংরেজ ব'লেই মনে হয় ।

আজ এতদিন পরে এই ধীপে প্রথম জীবিত মানুষ দেখে ছেলেদের মনের অবস্থা কেমন হ'লো, তা সহজেই অস্বপ্ন করা যায় । গরডন আর ত্রিয়ঁ। হাঁটু মুড়ে ব'লে মহিলাটির হাতের নাড়ি পরীক্ষা ক'রে দেখলে—প্রথমটা জীবনের কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না । শেষটার তাঁর নাকের কাছে একটা কাঁচ

ধ'রে রেখে গরডন হঠাৎ মোল্লাসে ব'লে উঠলো, 'এই চাখো, একটু-একটু নিঃশ্বাস পড়ছে !

ধরাধরি ক'রে তারা মহিলাটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তাদের সম্মিলিত শুক্রাণা ও চেষ্টায় ভদ্রমহিলার জ্ঞান ফিরে এলো। কিছু খেয়ে নেবার পর তিনি কিঞ্চিৎ সূস্থ বোধ করতে লাগলেন—কিন্তু তবু তাঁকে কোনো রকম বিরক্ত না ক'রে তারা একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে দিলো। কৌতূহলে কেটে পড়লেও কোনো প্রশ্ন করলে না তারা।

সন্ধ্যার পর সবাই যখন খেতে বসলো, তখন খেতে-খেতে ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

ভদ্রমহিলা আসলে মারকিন। তাঁর আসল নাম ক্যাথারিন রেডি, সবাই তাঁকে 'কেট' ব'লে ডাকে।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে জাহাজে ক'রে চিলি যাচ্ছিলেন কেট, তাঁদের জাহাজটির নাম ছিলো 'সেভান'। সমুদ্রযাত্রা প্রথম ভাগটা বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু মধ্য-সমুদ্রে এক ভয়ানক অঘটন।

ওই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ওয়ালস্টোন নামে একটা লোক ছিলো, আর ছিলো তার সাতটি সঙ্গী : ব্যান্ড, রক, হেনলি, কুক, ফব্ব'স, কোপ আর পাইক। লোকগুলো যেন প্রত্যেকেই শয়তানের বিভিন্ন মূর্তি। চেহারাও একেক জনের দানবের মতো—স্বভাব ততোধিক ভীষণ। এই আট জনে হঠাৎ একদিন জাহাজের কাপ্তেনকে খুন ক'রে জাহাজটা দখল ক'রে বসলো। তারপর একে-একে যাত্রীদেরও তারা হত্যা করলে, জাহাজের ডেকে রক্তগড়া ব'য়ে গেলো। শুধু ছ'জনকে তারা রেহাই দিলে। এক, কেট—স্বয়ং ফব্ব'স সর্দারকে ব'লে-ক'য়ে তাঁকে বাঁচায়; আর অল্পজন হচ্ছে ইভান্স, জাহাজের ফার্স্ট মেট—সে না থাকলে জাহাজ চালাবে কে, এই ভেবে তাকে হত্যা করা হয়নি। তবে তাকে তারা মোটেই স্নহজরে রাখলে না। বেশ বোঝা গেলো, প্রয়োজন ফুরোলেই তারা ইভান্সকে এবং হয়তো কেটকেও হত্যা করবে।

ওয়ালস্টোনের মতলব ছিলো জাহাজটিকে সোজা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে মধ্যযুগের বোম্বার্ডারদের মতো তারা ক্রীতদাসের ব্যবসা চালাবে। ইভান্সকে দিয়ে তারা জোরজবরদস্তি ক'রে সেইভাবেই জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করলে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের সব মতলবই কৈশে গেলো। কয়েকদিন পরে কী

ক'রে যেন হঠাৎ ভীষণ আশ্রয় নেগে গেলো জাহাজে । অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন কিছুতেই সে আশ্রয় নেভানো গেলো না, তখন সবাই জাহাজের আশ্রয় জলাঞ্জলি দিয়ে একটা বড়ো নৌকোর চ'ড়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো—সঙ্গে নিলে গোটাকয়েক বন্দুক, কিছু খাবার-দাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম । হেনলি নামতে গিয়ে জলে প'ড়ে যায় । তাকে আর উদ্ধার করা যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে একদল হাঙর এসে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফ্যালো ।

দু-দিন দু-রাত্রি ধ'রে নৌকো ভেসে চলে—কিন্তু তবু কোনোদিকেই ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি । তারপর হঠাৎ সেই ভীষণ ঝড় উঠলো—সেই ঝড়ের মুখে প'ড়ে দিশেহারা নৌকোটা সোজা চারম্যান আইল্যাণ্ডে এসে ওঠে । তীরে ওঠবার আগেই একটা ডুবো পাথরের গায়ে ভীষণ ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে চুরমার হ'য়ে যায় ।

ওয়ালস্টোন আর তার স্ত্রীভাতরা একটানা ঝড়-বাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছিলো—আর তাদের ঘুরবার কোনো সামর্থ্য ছিলো না ।

তীরের কাছাকাছি এসেই নৌকো এক প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে একেবারে উলটে যায় । ফলে পাঁচজন আরোহী সমুদ্রের জলে ভেসে যায় আর বাকি দু'জন বালির উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে । আর কেট নৌকোর বিপরীত দিকে ছিটকে প'ড়ে যান ।

অনেকক্ষণ হতচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন কেট । জ্ঞান হবার পর তিনি ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দ্যাখেন, ক্লাস্তিতে তাঁর সারা শরীর একেবারে অসাড় হয়ে গেছে । ওই অবস্থায় এক সময়ে তিনি গুনতে পান ওয়ালস্টোনের গলা, তার সঙ্গে ব্র্যান্ড্ আর রকও ছিলো । কেট বুঝতে পারলেন যে তারা মোটেই ভেসে যায়নি, ডাঙায় উঠেছে, আর এখন সঙ্গীদের খুঁজতে বেরিয়েছে ।

ওয়ালস্টোনেরা কেটকে দেখতে পায়নি । তাদের কথাবার্তা থেকে কেট বুঝতে পারলেন, ইভান্স্ বেচারি ছাড়া পায়নি, কোপ আর কুকের পাহারায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে । বন্দুক আর টোটাগুলিও বোম্বেরা জলে ভেসে যেতে দেয়নি । তারপর ফরব্‌স্ আর পাইককে তুলে নিয়ে নৌকোটা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বোম্বেরা কোথায় যেন চ'লে গেলো । তারা চ'লে গেলেই কেট সেই অবসর দেহেই পাগলের মতো ছুটতে থাকেন ।

তারপর যে কী হয়েছিলো, তা তিনি কিছুই জানেন না ।

কেটের এই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান শুনে ছেলেরা যেমন অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনী পড়ার আয়োদ পেলে, তেমনি আবার বেশ ভয়ও পেয়ে গেলো। এতদিন চারম্যান আইল্যাগে তারা বেশ নিরাপদে ছিলো, আজ সেই ধীপে এমন সাতজন নিষ্ঠুর বোম্বটে পা দিয়েছে যারা যে-কোনো রকম বিবেকহীন কুকর্ম থেকে বিরত হবে না—যদি বোম্বে কিছু লাভ হবে, তাহ'লে যা খুশি তাই তারা ক'রে করতে পারে। ফরাশি গুহার সন্ধান একবারটি পেলে তারা কি আর ছেলেদের ছেড়ে দেবে? কক্খনো না। গুহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খাবারদাবার তারাই দখল ক'রে নেবে—কেড়ে নিতে গিয়ে রক্তপাত করতেও তাদের বুকে একটুও বাধবে না।

এদিকে আরেকটা ভয়ানক বিপদ আসন্ন। ছেলেরা না হয় সাবধানে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলো, কিন্তু ডোনাগানেরা? তারা তো এই বোম্বটের কথা কিছুই জানে না! তারা হয়তো নিশ্চিন্ত মনে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে, হয়তো তাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে বোম্বটেরা তাদের হৃদিশ জানতে পেরে তাদের খুঁজে বার করবে। তারপর...

না না, ডোনাগানদের ফিরিয়ে আনা চাই-ই চাই। এখন সকলের দলবদ্ধ হ'য়ে থাকা দরকার। নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ঈর্ষা, বিরোধ হৃদয় ভুলে গিয়ে একজোট হ'য়ে দস্যুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা উচিত।

ত্রিয়'ী বললে, 'মোকোকে নিয়ে আমি না-হয় একুনি বেরিয়ে পড়ি। রাতের অন্ধকারে বেশ গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়া যাবে।'

গরডন অবাক হ'য়ে বললে, 'এই আধার রাতেই বেরবে? কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করলে হ'তো না?'

'না গরডন, অপেক্ষা করার সময় আর নেই। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। একুনি বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের।'

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তর-তর ক'রে জল কেটে চলেছে একটি নৌকো—নৌকোয় ব'সে আছে দুটি মাত্র কিশোর, ত্রিয়'ী আর মোকো। ত্রিয়'ী চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কী দেখে সে আশ্চর্য মোকোর হাতে একটু চাপ দিলে।

অক্ষুট স্বরে মোকো বললে, 'কী?'

ত্রিয়'ী ফিশ-ফিশ ক'রে বললে, 'ওই জাখো!'

দেখা গেলো, ঈস্ট-রিভারের তীর থেকে কয়েকশো গজ দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় গনগনে আগুন জ্বলছে।

কারা ওখানে আগুন জ্বালিয়ে ব'সে আছে? বোম্বটেরা? না ডোনাগানেরা?

তীরে নৌকো ভিড়িয়ে কোমরবন্ধে রিভলবার এঁটে ত্রিয়ঁ হাতে একটি কুঠার নিয়ে ডাঙায় নামলো।

চারদিকে বোপঝাড়, আগাছা। হাতে উত্তত কুঠার থাকলে কী হবে, ভয়ে আশঙ্কায় তার বুক বেশ ছুরুছুরু করছে। খানিকটা গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা মস্ত কালো ছায়া অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধাবমান। পরমুহূর্তেই শোনা গেলো এক গভীর ক্লান্ত হিংস্র গর্জন, আর সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মস্ত কালো জিনিস লাফিয়ে পড়লো। সেই কালো যুঁতিটি আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড জাগুয়ার।

আর ঠিক তখনই শোনা গেলো কার করণ আর্তনাদ।

চীৎকার শুনেই ত্রিয়ঁ চমকে উঠলো : ‘এ যে ডোনাগানের গলা !’

মুহূর্তেকও দেরি না করে ত্রিয়ঁ কুঠার হাতে সামনের দিকে ছুটে গেলো ! ডোনাগান তখন কঙ্কল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো, হঠাৎ জাগুয়ারের আক্রমণে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চ্যাচাচ্ছে, কিছুতেই বন্দুকটাকে আর হাতের নাগালে পাচ্ছে না।

চক্ষের পলকে ত্রিয়ঁর কুঠার ভীষণ বেগে জাগুয়ারের মাথার উপর নেমে এলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। তক্ষুনি জাগুয়ারটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কঙ্কলে জড়ানো ছিলো ব’লে ডোনাগান খুব জোর বেঁচে গেলো—শুধু তার ডান কাঁধে সামান্য আঁচড় লেগেছে—তাছাড়া আর কিছুই তার হয়নি।

ততক্ষণে ডোনাগানের অস্ত বন্ধুরাও সেখানে এসে পড়েছে। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ডোনাগান ত্রিয়ঁকে যে কী বলবে, তা ভেবে পাচ্ছিলো না। কিন্তু ত্রিয়ঁ তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো স্বেযোগই দিলে না, তাড়তাড়ি তাদের টেনে এনে নৌকোর বসালে। তৎক্ষণাৎ মোকো নৌকো ছেড়ে দিলো। নৌকোর ব’সে ত্রিয়ঁ ধীরে-ধীরে ডোনাগানদের সব কথা খুলে বললে। কেট, সেভান’ আহাজ, ওয়ালস্টোন, দ্বীপে জলদস্যুদের আবির্ভাব—কোনো তথ্যই সে বাদ দিলে না।

এই ঘটনার পর থেকে কেবল ডোনাগান নয়, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—সকলের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেলো, এখন আর দলের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই—সবাই সকলের অন্ত সমান ব্যাকুল। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা তারা আবিষ্কার করেছে একে অন্তকে তারা কতখানি ভালোবাসে। ঈর্ষা, উচ্চাশা, বিরোধ—এ-সব যেন মস্তবলে অদৃশ হ’য়ে গেলো।

কেটও এরই মধ্যে ছেলদের মনপ্রাপ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছেন। ছেলেরা

তাঁকে 'আন্টি' ব'লে ডাকে। কেটের ইচ্ছে : কোনো রকমে ইভান্‌সকে এই দলের মধ্যে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসা।

'আহা ! ইভান্‌স বড়ো ভালোমানুষ !'

যুড়ির ল্যাজ

এখন পর্যন্ত যদিও বোম্বটেদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবু তাদের ভয়ে ছেলেদের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধই হ'য়ে গেছে। দ্বীপের সর্বত্র ছেলেদের বসবাসের নানা চিহ্ন ছড়ানো। বিশেষ ক'রে সেই বেলুনটা। স্টেট 'তো চোখে পড়বেই। দস্যুরা একবার সন্ধান পেলে কি আর রক্ষে আছে ?

শেষে একদিন রাত্রিবেলায় কয়েকজন গিয়ে চুপি-চুপি বেলুনটা খুলে নিয়ে এলো। তার পর থেকে তারা প্রায়ই সাবধানে রাত্রিরে বেরুতো, সন্তর্পণে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতো কোথাও কোনো আগুন দেখা যায় কি না। কিন্তু এভাবে, এই অনিশ্চয়ের মধ্যে, আর ক-দিন চলে ? প্রতি মুহূর্তে কেবল যদি ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, কখনও যদি নিশ্চিত ক'রে জানা না-যায় দস্যুরা কোথায় আছে, তাহ'লে এখানে বসবাস করাই যে তাদের পক্ষে মুশকিল হ'য়ে উঠবে !

অবশেষে ব্রিয়'। এক অভূত কাণ্ড ক'রে বসলো। অনেকদিন আগে সে একটা বইয়ে পড়েছিলো, কবে নাকি কোন ইংরেজ মহিলা এক অতিকায় যুড়ির সঙ্গে নিজেকে আঁটো ক'রে বেঁধে নিয়ে আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। ব্রিয়'। ঠিক করলে সেও ও-রকম করবে।

আগেকার যুড়ির চাইতে আরো বড়ো আরো বিরাট একটা যুড়ি তৈরি করা হ'লো। এই বিরাট যুড়ি ওড়াতে তেমনি মজবুত সূতোর দরকার। সে-কাজ হাসিল করা হ'লো জাহাজের লগ-রীল-এ জড়ানো ইম্পাতের সূতো। অর্থাৎ লগ-লাইন দিয়ে ১ জাহাজের মাস্তলের গায়ে যে-ধরনের বড়ো-বড়ো যুড়ি লাগানো থাকে, এবং যার মধ্যে একজন লোক দাঁড়ালে একেবারে তার বুক পর্যন্ত যুড়ির ভিতর থাকে—অর্থাৎ যাকে নাবিকদের পরিভাষায় বলে 'কাকের বাগা'—তেমনি একটি যুড়ি যুড়ির সঙ্গে বাঁধা হবে।

প্রথমে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্তে দেড় মণ ওজনের পাথর ভ'রে যুড়ি

ছেড়ে দেয়া হ'লো। অবাক কাণ্ড ! সেই বিপুল ভার নিয়ে ঘুড়িটা দিব্যি ফর-ফর ক'রে আকাশে উঠে গেলো। বেশ চমৎকাভাবেই উড়তে লাগলো ঘুড়িটা— দেড় মণ ভার বহন করেছে বলে কিছু যে বেশামাল হয়ে পড়েছে, তা মনে হ'লো না। তখন অনেক কষ্ট ক'রে লগ্ন-রীল-এ সূতো গুটিয়ে-গুটিয়ে সে-ঘুড়ি নিচে নামানো হ'লো।

এবারে ওই পরীক্ষার নিরিখেই ঘুড়ির মধ্যে লোক গঠার পালা। কাজটা খুব সহজ নয়। রীতিমতো বৃকের পাটা চাই সেইজন্মে—চাই প্রচুর সাহস, শক্ত স্নায়ু, বেপরোয়া ডাকাবুকো ভঙ্গি। কারণ মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে।

ত্রিয়ণী বললে, 'এবার ঘুড়িতে কে উঠবে বলা ?'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো জাক, সে বললে, 'আমি উঠবো।'

ডোনাগান, উইলকক্স ও অনুরাগ 'আমি-আমি' রব তুলে গোল শুরু ক'রে দিলে।

তখন জাক তার দাদার হাতছুটি ধ'রে বললে, 'তুমি অনুমতি দাও, আমি উঠি ! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এবার করতে দাও।'

জাকের কথায় ডোনাগান, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই খুব চমকে গেলো। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ? তার মানে ? জাক এ কী বলছে ?

জাক তেমনি রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আজ আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও, ত্রিয়ণী।' তারপর ডোনাগানের দিকে ফিরে কল্পিত স্বরে বললে, "হ্যাঁ, ডোনাগান, আমি একটা মারাত্মক অপরাধ করেছি—তার প্রায়শ্চিত্তের জন্মে আমারই সর্বাগ্রে এই বিপজ্জনক কাজে নামা দরকার। আজ যে তোমরা এই নির্জন বীপের উপর নির্বাসিত হয়েছো, এত কষ্ট পাচ্ছেো, এই দুই বছর এত নিগ্রহ ভোগ করছো, সে কার জন্মে, জানো ? জানো, কেন হঠাৎ আমাদের জাহাজ রাতের অন্ধকারে অকল্যাণ্ড বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রে ভেসে আসে ? জানো, কে তোমাদের এত বিপদ-আপদের জন্মে দায়ী ? আমি। হ্যাঁ, তোমরা সকলে যখন যুগ্মে ছিলাম, তখন উজ্জ্বল আমি, বোকা আমি মজা করার জন্মে জাহাজের দড়ি খুলে দি। ভেবেছিলুম ভারি আনন্দ হবে। আমি খেলার ছলে যা করেছিলুম, তার ফল যে শেষ পর্যন্ত এমন নিদারুণ হবে, তা বুঝতে পারিনি। যখন দেখলুম প্রবল হাওয়ার আমাদের ছোটো জাহাজ বন্দর ছেড়ে ক্রমশ বারদরিয়ার এগে পড়েছে, তখন ভয়ে আমি এতই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলুম যে চোঁচিয়ে তোমাদের ডাকতে পর্যন্ত পারিনি। অনেকক্ষণ আমি ডেক-এ চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে সারেঙহীন নোঙরতোলা জাহাজের খামখেয়াল দেখেছিলুম আর প্রাণশর্মে ভগবানকে

ডেকেছিলুম। শেষে যখন জাহাজ মধ্যসমুদ্রের উপর দিয়ে হাওয়ার তোড়ে হ-হ ক'রে ভেসে চলতে শুরু করে, তখন আমি ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত গোবেচারার মতো, ভালোমাহুষের মতো লুকিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি, সারা রাত ঘুমতে পারিনি আশঙ্কায়। বলো, তোমরাই বলো, এই মারাত্মক অপরাধের জন্যে আমার কি কোনো ক্ষমা আছে।

বলতে-বলতে জাক কান্নায় একেবারে আকুল হয়ে গেলো, আর ত্রিয়ঁা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিতভাবে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্তরা তো বিন্ময়ে হতবাক!

খানিকক্ষণ পরে ডোনাগান বললে, 'এতদিনে তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, জাক। তোমার মতো অমন হালিখুশি ফুঁতিবাজ ছেলে এ-ছ-বছর বে-রকম মনমরা হ'য়ে দিন কাটিয়েছো, তাতেই তোমার সমস্ত দোষ কেটে গেছে। আর ত্রিয়ঁা, এইবার আমি বুঝতে পারছি, কেন তুমি সব বিপজ্জনক কাজে সকলকে রেখে জাককে পাঠাতে!'

সবাই তখন জাককে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে শাস্ত করলে। তাদের সাধনা ও সহায়ত্ব পেয়ে জাক এক চোখে হাসি অন্য চোখে কান্না নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে উঠলো। এবার ঝুড়ির স্ততো ছাড়া হবে—কিন্তু হঠাৎ ত্রিয়ঁা ঝুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললে, 'জাক, নেমে আয় তুই। আমিই ওতে উড়বো, ঠিক করেছি।'

ঝোড়ো কাকের আবির্ভাব

অনেক রাত্রে নিবিঘ্নে সেই বিপজ্জনক আকাশ-অভিযান সাজ ক'রে ত্রিয়ঁা ফিরে এলে ছেলেরা তাকে ঘিরে প্রস্নে প্রস্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। কিন্তু তাদের সব প্রশ্নের উত্তরে অন্ত্যস্ত সংক্ষেপে ত্রিয়ঁা মোক্ষা কথাটি জানিয়ে দিলে, 'ঝোড়োটার এখনও দিব্যি বহাল তবিসতে চারম্যান আইল্যাওে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সেদিন ২৪শে নভেম্বর। ত্রিয়ঁা আর গরভন মৌকোর ক'রে জীল্যাও-রিভারের ওপারে গিয়েছিলো। মতলব ছিলো, ওদিকে যে একটি সড় পথ আছে, সেটি কোনো রকমে একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে।

নৌকো থেকে নেমে তীর থেকে শ্রায় দেড়শো গজ দূরে গেছে, হঠাৎ ত্রিয়ার
অনুভব করলে তার জুতোর তলায় কী-একটা শক্ত জিনিশ মচমচ শব্দ করে
ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলো। তুলে ত্যাখে, সেটা একটা তামাকের পাইপ।

কী সর্বনাশ! এটা এখানে কোথেকে এলো?

‘নিশ্চয়ই দস্যুরা এদিকে এসেছিলো,’ শিবর্ণ মুখে বললে গরডন, ‘তাদেরই
একজন বোধহয় ফেলে গেছে।’

‘ক্রাসিয়া বদোয়ার পাইপও তো হ’তে পারে।’

হ’তে যে পারতো না, তা নয়। কিন্তু সেটা যে বদোয়ার তামাক খাবার
পাইপ নয়, তা তক্ষুঁন স্পষ্ট করে বোঝা গেলো। কারণ পাইপের মধ্যে কিছু
পোড়া তামাক গোঁজা ছিলো, শুঁকে দেখা গেলো টাটকা তামাকের গন্ধ।
নতুন তামাকের মধ্যে যেমন একটা সতেজ কাঁজ থাকে, পাইপের নলচেয় সেই
কাঁজ পাওয়া গেলো। নিশ্চয়ই ওয়ালস্টোনের দলের কেউ এখানে জুল
ক’রে এটা ফেলে গেছে। ওয়ালস্টোন তবে তার সাজোপাজ নিয়ে একদূর পর্যন্ত
এসেছিলো!

সেখানে আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না-ক’রে তারা দু’জনে তাড়াতাড়ি গুহার
ফিরে এলো।

এখন কোথায় আছে দস্যুরা? হয়তো খুব কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে
ওৎ পেতে ব’সে আছে! হয়তো ছেলেদের তারা দেখতে পেয়েছে এর মধ্যে,
হয়তো আজ রাত্তিরেই তারা ফরাশি গুহা আক্রমণ ক’রে বসবে।

কিন্তু এখন অহেতুক ভয় পেলে চলবে না। ওই নির্ভর বোম্বটেগুলোর
হাত থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই কথাই ভাবতে হবে সবাইকে।
তারপর সেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা কাজে খাটাতে হবে। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য
করার জন্য গোয়েন্দাকাহিনীর অভূতকর্মা নায়কের মতো আশ্রয় চেষ্টা করতে
হবে সবাইকে।

দু’দিন গেলো ভীষণ গরম, তারপর ২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যা থেকেই আবার দেখা
দিলো তুমুল ঝড়বাদল।

ছেলেরা গুহার ভিতরে ছয়টি বন্ধ ক’রে ব’সে আছে।

ক্যানও এতক্ষণ কুণ্ডলী পাঙ্কিয়ে মেঝের ব’সে চূপচাপ ঝিমোচ্ছিলো, মাঝে-
মাঝে লাজুল আফালন ক’রে মশা তাড়াচ্ছিলো। হঠাৎ এক সময় সে ছয়টির
কাছে ছুটে গিয়ে ভীষণভাবে গর্জন করতে শুরু ক’রে দিলে। তারপরেই
অকস্মাৎ সেই শৌ-শৌ হাওয়া-বওয়া বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্তিকে স্তম্ভিত ক’রে

দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হ'লো। স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ—তাতে কোনোই ভুল নেই। ফরাশি গুহার একশো হাতের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বন্দুক ছুঁড়েছে! আচমকা সেই বন্দুকের শব্দ শুনে ছেলেদের বুকের মধ্যে যেন অবিশ্রাম হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো। এই দারুণ দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রেও দস্যুরা তবে ফরাশি গুহা আক্রমণ করতে এসেছে!

ডোনাগান, ত্রিয়ী, গরডন, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই যে-যার পিস্তল-বন্দুক নিয়ে স্পন্দিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলো, প্রবল ধাক্কা কখন গুহার দরজা ভেঙে পড়ে। ঠিক এমন সময় তাদের কানে এলো এক করুণ, অসহায় ও হতাশ আর্তনাদ : 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছে, বাঁচাও!'

সেই চীৎকার শুনে কেট দুয়ারের কাছে এগিয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন— বোঝা গেলো কী যেন শোনবার চেষ্টা করছেন।

আবার সেই আকুল করুণ আর্তনাদ শোনা গেল—আর শোনবামাত্র কেট ব'লে উঠলেন, 'শিগ্গির দরজা খুলে দাও, শিগ্গির!'

কোনো কথা না-ব'লে ছেলেরা তাঁর আদেশ মাথা পেতে মেনে নিলো : দরজা খুলে দিতেই একজন বলিষ্ঠ কিন্তু ক্লান্ত ও বয়স্ক নাবিক ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে ছড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো। অবসাদে তখন তার শরীরের সব জোড়গুলো যেন আলাগা হ'য়ে যাচ্ছে!

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

লোকটা আর কেউ নয়, সেভান জাহাজের কাস্ট মেট ইভান্স।

ঘরে ঢুকেই ইভান্স তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কান পেতে অনেকক্ষণ কী যেন শোনবার চেষ্টা করলে। সে যে কী শুনতে চাচ্ছে, তার আর্ত মুখ দেখে বোঝা গেলো না : সম্ভবত তার পিছু-নেয়া দস্যুদের পায়ের শব্দ। শেষটায় কিছুটা নিশ্চিত হ'য়ে মুখ কেব্রাতেই একসঙ্গে এতজন কিশোরকে দেখে সে অবাক হ'য়ে গেলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো কেটের দিকে। তার বিমূঢ় দশা আরও বৃদ্ধি পেলো, অবাক হ'য়ে বললে, 'একি! আপনি এখনও বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, ইভান্স, এখনও আমি বেঁচে আছি—মরিনি!' হাসতে-হাসতে উত্তর

দিলেন কেট, 'তুমিও যেমন ছেলেদের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেছো, আমিও তেমনি মরতে ব'সেও শুধু এদেরই জন্তে বেঁচে গেছি।'

অবসন্ন ইভান্সকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো অনেকক্ষণের মধ্যে কুটোগাছটিও সে দাঁতে কাটেনি। তাই ছেলেরা তাড়াতাড়ি তার জন্তে কিছু খাবারের ব্যবস্থা ক'রলো। আহারের পর কিঞ্চিৎ স্থস্থ হ'লে সে ধীরে-ধীরে ছেলেদের সমস্ত কাহিনী শুনলো, তারপর নিজের কাহিনীও শোনালে।

জল থেকে উদ্ধার পাবার পর ওয়ালস্টোনেরা ইভান্সকে নিয়ে যেখানে আশ্রয় নেয় সেটা ডিসেপশন বে-র তীরে বীয়ার-রক-হারবারের একটা গুহা ব'লে ওদের মনে হল। মাথা গৌজার একটা জায়গা খোঁজা ক'রে নেবার পর প্রথমেই তারা গিয়ে ওই ভাঙা নৌকোটা কোনোরকমে ভাসিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসে ঐ গুহার সামনে।

নৌকার একটা দিক একেবারে ঝুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো। যন্ত্রপাতি থাকলে সেটাকে মেরামত ক'রে হয়তো সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার উপযোগী করা যেতো, কিন্তু তার অভাবে কিছুই করা হয়নি।

ডোনাগান বললে, 'আমাদের কাছে কিন্তু সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে।'

'তোমাদের কাছে যে যন্ত্রপাতি আছে, ওয়ালস্টোন তা আগেই জানতে পেয়েছে,' বললে ইভান্স। 'শুধু তা-ই নয়, দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, আর সেই লোকগুলিও যে কত বড়ো বড়ো, তাও সে অনেক আগেই জেনে ফেলেছে। সব গুলুক-সন্ধান সে জানে—'

গরডন একটু ভয় পেয়ে গেলো। 'কেমন ক'রে জানলো?'

ইভান্স বললে, 'দিন-আষ্টেক আগে ওয়ালস্টোনের সঙ্গে আমরা তখন বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ হৃদের তীরে একটা অদ্ভুত জিনিশ দেখে আমরা সকলেই অবাক হ'য়ে গেলুম। দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, সেটা আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলুম। জিনিশটা আর কিছুই নয়, বেতের কাঠামোর উপর লাগানো—'

ইভান্সের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ডোনাগান বললে, 'ওঃ, সেটা তো আমাদের ঘুড়ি!'

'তাই নাকি?' ব'লে ইভান্স এই অদ্ভুতকর্মা ছেলেদের দিকে তারিফ করার ভঙ্গিতে তাকালো। 'বা-ই হোক, সেই মুহূর্ত থেকে ওয়ালস্টোন জানবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো, এই লোকগুলো কারা? আর আমিও সেই মুহূর্তে মনে-মনে সংকল্প ক'রে নিলুম, এবার যেমন ক'রেই হোক এদের হাত থেকে পালাতে

হবে। স্বীপের বাসিন্দারা যদি নরখাদক জঙলিও হয়, তাহ'লেও পালিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করবো, কিন্তু তবু ওই খুনে বোম্বটেদের সঙ্গে থাকবো না—জঙলিরাও তুলনায় এই দস্যুদের চেয়ে ভালো—অস্তুত অবস্থার তাতে সবিশেষ তারতম্য হবে না। ওয়ালস্টোন বোধকরি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো, কারণ সেদিন থেকে সে আমাকে সব সময় চোখে-চোখে রাখতো—কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তো না। ওয়ালস্টোন তখন চারদিকে অনুসন্ধান শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু স্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে হৃদ হ'য়ে গেলেও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। স্বীপের কোনো দিকেই এমন-কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না যাতে মনে হয় সেখানে লোকের বাস আছে।'

'তার কারণ,' ব্রিয়'ী ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে, 'আমরা ফরাশি গুহা থেকে মোটেই বেরোতুম না আর ককখনো বন্দুক ছুঁড়তুম না। বন্দুকের বিক্রমে আমরা রীতিমতো নোটিশ জারি ক'রে দিয়েছিলুম।'

ইভান্স বললে, 'কিন্তু তোমাদের অত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের কথা জানতে পেরেছিলুম। তোমরা বোধহয় একদিন রাত্তিরে এক মুহূর্তের জন্য দুয়ার খুলেছিলে, তখন তোমাদের লঠনের আলো আমাদের চোখে পড়ে। পরদিন সকালেই ওয়ালস্টোন নিজে তোমাদের খোঁজ নিতে বেরোয়। একটা নদীর ধারে একটা ঝোপের মধ্যে সে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিলো।'

ইভান্সের কথায় বাধা দিয়ে ব্রিয়'ী বললে, 'তা আমি জানি। গরডন আর আমি সেখানে একটা তামাকের পাইপ কুড়িয়ে পাই।'

'ঠিক, ঠিক!' ইভান্স ঘাড় নেড়ে বললে, 'তামাকের পাইপ হারিয়ে ওয়ালস্টোনের সে কী রাগ! হাতের কাছে থাকে পেতো তাকেই সে তখন হয়তো ছিঁড়ে ফেলতো। যাই হোক, সেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকে সে তোমাদের দেখতে পায়। একদল বাচ্চা ছেলে নদীর ওপারে ছুটোছুটি করছে দেখে তাঁর খুব আনন্দ হ'লো—পাইপ হারাবার রাগ প'ড়ে গেলো তখন, দিব্যি শরীফ হ'য়ে গেলো মেজাজ। তারা কয়েক জনে অনায়াসেই এই কটা ছেলেকে শাবাড় করতে পারবে। ফিরে এসে সে তখনই ব্র্যান্ডের সঙ্গে ফন্দি খাটতে বসলো—কেমন ক'রে ছেলেগুলোকে হত্যা ক'রে তাদের ঘর জবরদখল ক'রে নেওয়া যায়, তারই মতলব করতে লাগলো।'

ডোনাগান তখন রাগে ফুলছিলো। বললে, 'রাব্বল!'

‘রাকস ? সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে ?’ বললে ইভান্স, ‘তা নইলে কি আর শুধু-শুধু জাহাজের নিরীহ নির্দোষ লোকগুলোকে অমনভাবে হত্যা করে ? আর দলের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান হচ্ছে এই ওয়ালস্টোন ! সে মানুষ নয়—একটা পিশাচ ! এমন-কোনো অমানুষিক ও নির্ভর কাজ নেই যা সে হাসিমুখে করতে পারে না । তার উপর শরীরে তার অসম্ভব জোর—খাপা হাতির বল নিয়ে সে যে কী করবে তাই ভেবে পায় না । যাক, যা বলছিলুম । আজ সকালে ওয়ালস্টোন যখন দলবল নিয়ে কোথায় যেন বেরোল, আমাকে বসিয়ে রেখে গেলো ফরব্‌স্‌ আর রকের পাহারায় । আমায় তারা এমনভাবে চোখে-চোখে রেখেছিলো যে কিছুতেই পালাতে পারছিলুম না । তাদের হাত এড়িয়ে একটা মাছিরও বোধহয় গ’লে যাবার সাধা নেই । তাদের দু’জনেরই হাতে বন্দুক, আমার কোমরে শুধু একটা বড়ো ছুরি—ছুটে পালাবার চেষ্টা করলেই তারা আমাকে কুকুরের মতো গুলি ক’রে মারবে ।’

একটু দম নিয়ে ইভান্স আবার বলতে থাকে, ‘বেলা তখন দশটা, হঠাৎ দেখি কাছেই ঝোপের আড়ালে একপাল গুঅনাকো চ’রে বেড়াচ্ছে । গুঅনাকো দেখেই শিকারের আশায় যেই তারা দু’জনে ঝোপের দিকে এগোয়, অমনি আমিও মরিয়া হ’য়ে উল্টো দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে শুরু ক’রে দিই । আমায় ছুটে পালাতে দেখে তক্ষুনি তারা শিকার শিকের তুলে আমার পেছন-পেছন তাড়া ক’রে আসে । আমি পালাচ্ছি প্রাণের ভয়ে, নিজেই জানতুম না যে এত জোরে আমি ছুটতে পারি । আমিও প্রাণপণে বনের ভেতর দিয়ে ছুটছি, তারাও পেছনে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটে আসছে । একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই । শেষটায় নাগালের বাইরে চ’লে যাচ্ছি দেখে তারা দু-চারবার গুলি ছুঁড়তেও ছাড়ে না, কিন্তু ভগবানের দয়ায় একটা গুলিও আমার গায়ে লাগে না । উঃ, কী ছোটাই না ছুটেছি আজ সারা দিনে ! বেঁচে থাকার জন্যে লোকে কী না করে—এমনিতে সাধারণ অবস্থায় যেসব কর্ম তার কল্পনারও বাইরে, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালে সেইসব অসম্ভব কাণ্ডও সে সাধন ক’রে ফেলতে পারে !’ এই দার্শনিক উক্তি ক’রে দম নেবার জন্যে একটু থামলো ইভান্স । তাকিয়ে দেখলে, ছেলেরা জুল-জুল চোখে কান্নাসে তার কথা শুনছে । কথাগুলো শুনতে তাদের ভয়ও লাগছে, আবার কেমন রোমাঞ্চও হচ্ছে ।

ইভান্স আবার তার কাহিনীর খেই ধরল : ‘ক্রমে সন্ধ্যা হ’য়ে এলো । ভগবানও আমার উপর সদয় হলেন । হঠাৎ ভীষণ মেঘ ক’রে এলো, সঙ্গে-সঙ্গে

উঠলো দারুণ ঝড়। কিন্তু ওই ঝড়ের মধ্যেও রক আর ফস্‌ব্‌স্‌ তখনও আমার পিছু ছাড়েনি। বেগতিক দেখে আমি ঝপ্‌ ক'রে তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, অঙ্ককারে তারা অনেকে প্রথমটায় দেখতে পায়নি। সাঁতরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোয় তারা আমাকে আবার দেখতে পায়। তক্ষুনি তারা আমাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে। একটা গুলি প্রায় আমার কাঁধ ঘেসে চ'লে যায়, আমিও চক্ষের পলকে জলের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে অন্যখানে ভেসে উঠি। সেই অবস্থাতেই শুনতে পাই দু'জনে চীৎকার ক'রে বলাবলি করছে, “লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে বোধহয়!” “খুব সম্ভব। দেখলে না গুলি খেয়ে হতছাড়া তক্ষুনি নদীর জলে ডুবে গেলো!” “ধাক, আপদ গেছে!” এইসব বলাবলি ক'রে তারা তীর থেকে ফিরে যায়। আমিও তারা চ'লে যেতেই জল থেকে উঠে তোমাদের গুহার অনুসন্ধান করতে থাকি। কিন্তু যে ভীষণ ঝড়বাদল আর অঙ্ককার! কিছুই দেখতে পাবার জো নেই। হঠাৎ এমন সময়ে তোমাদের কুকুরের ডাক শুনতে পেলুম—সেই শব্দকে লক্ষ্য ক'রেই এই গুহার সামনে এসে তোমাদের ডাকতে থাকি।’

কাহিনী শেষ ক'রে ইভান্‌স্‌ বললে, ‘আজ থেকে আমিও যেমন তোমাদের উপর নির্ভর করবো, তোমরাও তেমনি আমার উপর বিশ্বাস রেখো। তোমাদের কোনো ভয় নেই।’

গরডন বললে, ‘আচ্ছা, ওয়ালস্টোনের সঙ্গে একটা আপোস ক'রে নিলে হয় না? অন্তত চেষ্টা ক'রতে দোষ কী? ধরুন, আমরা যদি ওদের ভাঙা নৌকোটা সারিয়ে দি? তাহ'লেও কি ওরা আমাদের ক্ষতি করবে?’

ইভান্‌স্‌ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। ‘ওদের সঙ্গে আপোস? শয়তানের সঙ্গে রফা? তুমি ওদের চেনো না! বিশ্বাসঘাতকতায় ওদের জুড়ি নেই। ঠাণ্ডা মাথায় কার্‌ক সর্বনাশ করতে ওদের চোখের পাতাটিও পড়ে না। আজ সাধু মেজে ভিক্ষে বেড়ালটির মতো তোমাদের সাহায্য নেবে—এমন ভাব করবে যেন ভাঙ্গা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, কালই হয়তো তোমাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সবাইকে হত্যা ক'রে পালাবে। তাছাড়া,’ ইভান্‌স্‌ আরো বললে, ‘তাছাড়া ওইভাবে যদি ওদের নৌকো তোমরা সারিয়ে দাও, আর তা নিয়ে ওরা চ'লে যায়, তাহ'লে তোমাদের গতি কী হবে কিছু ভেবে দেখেছো?’

‘আপনি কি—’ গরডন বিমূঢ়ভাবে বললে, ‘আপনি কি বলতে চান যে ওই নৌকো পেলে আমরা এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই!’

‘কিন্তু ওইটুকুন একটা নৌকোর ক’রে অত বড়ো প্রশান্ত মহাসাগর কি কেউ পাড়ি দিতে পারে ? ওই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ ?’

ইভান্স হেসে ফেললে। ‘হাজার হাজার মাইল হ’তে যাবে কেন ? এখান থেকে মাস্তুর মাইল-ত্রিশেক গেলেই এমন একটি দেশ পাওয়া যাবে, যেখান থেকে আমরা যে-কোনো বড়ো জাহাজের সাহায্য নিতে পারবো।’

অবাক হ’য়ে ডোনাগান শুধোলে, ‘মাত্র ত্রিশ মাইল ! তবে কি এই দ্বীপের চারদিকে কোনো সমুদ্র নেই ?’

‘আছে বইকি। তবে চারদিকে নয়, কেবল পশ্চিম দিকে। উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্বে আছে কেবল সমুদ্রের অল্পপরিসর সামান্য গভীর খাল। সে-সব প্রণালী অল্পক্ষণের মধ্যেই পেরুনা যায়। এখন বুঝেছো তোমরা এতদিন কোথায় বাস করছো ?’

গরডন তার অনুমান জানালে : ‘বোধহয় দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ওপর।’

‘হ্যাঁ, দ্বীপ তো বটেই,’ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ইভান্স, ‘দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি শত-শত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এও একটা দ্বীপ বইকি। এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দূরত্ব বোধহয় ত্রিশ মাইল, কি তার অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক। তোমাদের ইশকুলের মাপে এই দ্বীপের কী নাম দেয়া হয়েছে, জানো ?’

‘কী ?’ সমস্বরে জিগেস করলে সবাই।

‘হানোভার আইল্যান্ড।’

‘এটা তাহ’লে অনাবিষ্কৃত, অপরিচিত নতুন-কোনো দ্বীপ নয় ?’

ছেলেদের কৌতূহল দেখে ইভান্স তখন তাদের সেই এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ শোনাতে শুরু করলে।

শেয়ানে-শেয়ানে

ওয়ালস্টোনের দলের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইভান্স তাই ছেলেদের নিয়ে ভারি তোড়জোড় শুরু করেছে। বোধহয় সবাই সমান—কেউ-কেউ আবার নির্ভরতায় বেশি সরেশ। শুধু কেটের মতে ওয়ই মধ্যে ফরব্‌সকে নাকি একটু ভালো বলা যেতে পারে, কারণ সে-ই নাকি ওয়ালস্টোনকে বারণ ক’রে

বলেছিলো কেটকে যেন হত্যা করা না-হয়। কিন্তু ইভানসের ধারণা আবার ঠিক তার উল্টো—কারণ ইভানসকে তো ফর্ব্‌স্‌ই গুলি করেছিলো সেদিন।

তোড়জোড় তো তারা করছে, কিন্তু কোন দিক থেকে যে আক্রমণ আসবে তা-ই কেউ জানে না। তাদের মতলব বুঝতে পারলে ছেলেরা না-হয় ভালো ক'রে তৈরি হ'য়ে নিতে পারতো। কিন্তু দস্যুদের কোনোই সাড়াশব্দ নেই, ওয়ালস্টোন আজ দিন-কতক ধ'রে বড্ড চূপচাপ। আর এত চূপচাপ ব'লেই তার রকমশকম তাই বড়ো সন্দেহজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার হয়তো ধারণা কেট আর ইভানস আর বেঁচে নেই—কাজেই সে হয়তো ধ'রেই নিয়েছে যে ছেলের দলও তাদের কথা বিন্দুবিসর্গও জানে না। সুতরাং গোড়াতেই হয়তো সরাসরি লড়াই শুরু না-ক'রে সে জাহাজ-ডোবা নাবিক সেজে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যদি সে তা-ই করে, তাহ'লে ছেলেরা কী করবে, তাও মোটামুটি ঠিক করা হ'লো।

শেষ অবধি তাদের অনুমানই সত্য হ'লো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় গুহার দরজায় ধাক্কা আর ককণ মিনতি। দরজা খুলে ছেলেরা ছাগে রক আর ফর্ব্‌স্‌ ককণ মুখে দাঁড়িয়ে (লোকছুটি যে রক আর ফর্ব্‌স্‌ তা তারা পরে কেটের কাছ থেকে জেনেছিলো)। জাহাজ-ডোবা অসহায় নিরাশ্রয় নাবিক ব'লে পরিচয় দিয়ে ছেলেদের কাছে তারা আশ্রয় চাইলো। আগে থেকে সব না-জানলে কার সাধ্য ওদের ওই কাঁড়নি শুনে বোঝে যে তাদের পেটে-পেটে এত বিষ!-

ছেলেরা আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী হলধরে এনে তাদের খাওয়ালে, তারপর শোয়ার জন্তে ফরাশি গুহাটা দেখিয়ে দিলে। কেট কিংবা ইভানস কেউই তাদের সামনে বেরুলো না, তারা চোর-কুঠুরিটার সাবধানে লুকিয়ে রইলো।

দস্যুটি ফরাশি গুহাটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে নেহাত ভালোমানুষের মতো ককণ বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই ঘন গর্জনে তাদের নাক ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। আর এত নাক ডাকার বহর দেখেই ছেলেরা চটপট বুঝে নিলে এ-সবই তাদের ঘুমের ভান মাত্র।

রাত নটার সময় মোকোও একটা ককণ নিয়ে দ্বিবি নিশ্চিতভাবে ফরাশি গুহার শুতে এলো। চোখ মটকে মোকোকে দেখে নিয়ে দস্যুরা ভাবলে, মাঝরাতে উঠে হতভাগটার ষাড় মটকে কেলেই হবে।

ওয়ালস্টোন ও তার অস্ত্র স্তাঙাতরা তখন ফরাশি গুহারই আশপাশে ঘুরঘুর

করছিলো। কারণ রকের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিলো, মাঝরাতে সে ঘরের দুয়ার খুলে দেবে, আর তারা ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে ঘুমন্ত ছেলেগুলোকে হত্যা করবে।

ছেলেরা মোকোকে ও-ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে বাতায়ানের লক গলিটার দরজা খাটো করে বন্ধ করে দিলে। ওই দরজাটা বন্ধ করে দিলেই হলঘর আর ফরাশিগুহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর বন্ধ করে দিয়ে ছেলেরা চোর-কুঠুরিটার মধ্য থেকে ইভান্স আর কেটকে নিজেদের হলঘরে নিয়ে এলো।

এদিকে ফরাশিগুহায় গিয়ে কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও মোকোও কিন্তু এককোটাও ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান করেই পড়েছিলো কেবল। রাত বারোটায় সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে রক আর ফব্ব্‌স বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়চোখে তাদের উঠতে দেখেই মোকো চোখ বুজিয়ে ফেললে। অসুভব করলে তারা তার মুখের উপর ঝুঁকে দেখছে সে ঘুমোচ্ছে কি না। তাকে ঘুমন্ত মনে করে তারা তখন পা টিপে-টিপে দরজার দিকে অগ্রসর হলো। ছেলেরা আগে থেকেই ফরাশিগুহার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে তার সামনে বিস্তর পাথর সাজিয়ে রেখেছিলো, যাতে ওয়ালস্টোনেরা জোর করে দরজা ভাঙতে না-পারে। মোকো আড়চোখে দেখতে পেলে রক আর ফব্ব্‌স আশ্বে-আশ্বে পাথরগুলো সরাতে শুরু করেছে।

পাথর সরিয়ে রক যেই দরজার খিল খুলবে বলে খিলেনের উপর হাত দিয়েছে, অমনি কে যেন পাথরের মতো ভারি হাতে শক্ত করে তার কাঁধ চেপে ধরলো। সচমকে ফিরে তাকিয়ে সে ছাখে ইভান্স দৃঢ় হাতে তার কাঁধ চেপে ধরে তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও বোধহয় লোকে অতটা চমকায় না। ভীত অশ্রুট কণ্ঠে রক বললে, 'ইভান্স, তুমি! তুমি এখানে?'

ইভান্স বললে, 'হ্যাঁ, আমি ইভান্স; কিন্তু এখন তোমার ঘম!'

তক্ষুনি কেট আর একেবারে ছোটোরা বাদে হলঘরের সব ছেলেরা বন্দুক নিয়ে এই ঘরের মধ্যে ছুটে এলো। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স তিনজনে চক্ষের পলকে ফব্ব্‌সের উপর লাঞ্ছিয়ে পড়ে তাকে মেঝের উপর চেপে ধরলো। ওদিকে রক তখন ইভান্সের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভয়ানক ছটোপুটি শুরু করে দিয়েছে। ত্রিয়ারী, ডোনাগান আর বাস্টার যেই রককে ধরতে যাবে, অমনি সে একটা ছোরা বার করে ইভান্সের কাঁধে বসিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে

গেলো। ইভান্‌স্‌ আহত অবস্থাতেই দরজার কাছে এসে রকের অপস্থয়মান ছায়াশ্রুতি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তা রকের গায়ে লাগলো ব'লে মনে হ'লো না। সম্ভবত অক্ষত শরীরেই সে পালিয়েছে।

ইভান্‌স্‌ আর অন্ধকারে তার পিছু না গিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বললে, 'পালিয়েছে হতচ্ছাড়াটা! ষাই হোক, একটাকে তো পাকড়ানো গেছে। আয়, তোকেই আজ খতম করি!' এই ব'লে তক্ষুনি সে একটা ছোরা নিয়ে ফরুব্‌সের দিকে এগিয়ে গেলো।

এদিকে ছেলেরাও ফরুব্‌স্‌কে এমন জোরে চেপে ধরেছে যে তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে আসে আর কি। করুণভাবে কাকুতি মিনতি ক'রে সে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। তার চীৎকার শুনে কেট অগ্ন ঘর থেকে ছুটে এলেন। ফরুব্‌সের দশা দেখে কেট অমুনয় ক'রে বললেন, 'ফরুব্‌স্‌কে মেরো না ইভান্‌স্‌, ও একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলো!'

ইভান্‌স্‌ বললে, 'লোকটা ভয়ানক শয়তান, একে শেষ ক'রে ফেললেই ভালো হ'তো। আমাকে গুলি করার সময় তো ও কোনো কথা ভাবেনি! ষাই হোক, আপনার কথা আমি রাখছি। আজকের মতো অস্তত একে প্রাণে মারবো না।'

ছেলেরা তখন ফরুব্‌স্‌কে দড়ি দিয়ে আগাপাশতলা শক্ত ক'রে বাঁধলো, তারপর তাকে তুলে নিয়ে হলঘরে যাবার গলির পাশের একটা চোর-কুঠুরির মধ্যে কয়লার বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

সংঘর্ষ

ইভান্‌সের কাঁধে আঘাত ছিলো সামান্য, তাই সেজন্যে সে মোটেই বিব্রত হয়নি। ক্ষতটা পরিষ্কার ক'রে একটা পট্টি বেঁধে দিতেই বেশ স্বস্থ বোধ করলে সে।

সকাল হ'তেই বিন্না, সারজিস, ডোনাগান্‌ আর গরডনকে নিয়ে সে সশস্ত্র হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো। রককে পালাতে দিয়েই ষত গোল হয়েছে, এখন আর ঘরে চূপচাপ ব'লে থাকলে চলবে না। বোম্বটেয়া কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, খোঁজ মেরা দরকার। প্রয়োজন হ'লে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্তেও তৈরি

খাকতে হবে। দস্যদের চাইতে অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবাকর তো তাদেরই অনেক বেশি।

ইতিমধ্যে কেট ফর্ব্‌সের কাছে গিয়ে তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-ভুঝিয়ে তার কাছ থেকে বোম্বটেদের লক্ষ্যে ছোটোখাটো দু-চারটে খবর যোগাড় করেছেন। কিন্তু সে-সব খবর মোটামুটি সকলেই জানে—নতুন কোনো তথ্য তাতে নেই। ফর্ব্‌স যেন কেমনতর হ'য়ে পড়েছে। চূপচাপ প'ড়ে কী যেন ভাবছে সব সময়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে ইভান্‌স বললে, 'সাবধান কিন্তু! সব সময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে। দস্যদের দেখতে পেলেই গুলি কোরো, কোনো রকম দ্বিধা রেখো না।'

পা টিপে-টিপে অনেকটা রাস্তা গিয়ে এক গাছতলায় দেখা গেলো কিছু অস্ত্র প'ড়ে আছে—তখনও ভালো ক'রে নেভেনি, অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয়ই দস্যরা এখানে কালকে রাত কাটিয়েছিলো—হয়তো একটু আগেও এখানে ছিলো তারা। সবাই আরো সাবধান হ'য়ে গেলো—এখন কী করবে চূপি-চূপি আলোচনা ক'রে তা-ই ঠিক করছে, এমন সময় হঠাৎ কানের পাশেই একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। তক্ষুনি একটা গুলি একেবারে ত্রিয়ার কান ঘেঁষে চ'লে গেলো। আচম্বিত আক্রমণটা সামলে ওঠার আগেই আরো তিনটে বন্দুকের শব্দ হ'লো একযোগে।

ডোনাগানের রক্ত বোধহয় একটুতেই চন-চন ক'রে ওঠে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তক্ষুনি সে খ্যাপার মতো ঝোপের দিকে ছুটে গেলো। ঝোপের ভিতরকার গর্জমান বন্দুকটির ঝিলিক লক্ষ্য ক'রে তার বন্দুক ততক্ষণে আগুন উগরে ফেলেছে।

অন্তরাণ্ড ডোনাগানের পিছন-পিছন ছুটে গেলো। গিয়ে জ্বাখে সেখানে আর কেউ নয়, শুধু ডোনাগান একটা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। মৃতদেহটি পাইকের। একটু আগেই পাইক এদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে কোনো দ্বিধা দেখায়নি, অথচ তবু ডোনাগানের মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কেমন একটা জরাতুর ভাব, সারা মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। যত বদমায়েশই হোক না কেন, একজন জ্যান্ত মানুষকে মেরে তার সারা গা কেমন যেন করছে। এত সে শিকার ভালোবাসে, তবু আত্মরক্ষার জন্তুও মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে তার নাকমুখ দিয়ে যেন হলুকা বেরুচ্ছে।

অথচ তখন সবাই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলাফেরা করছে। ভাবনা

চিত্তার কোনো অবসর নেই। অস্ত্র দস্যুরা কোথায় আছে কে জানে ! কোন আড়াল থেকে তাদের বন্দুক বৃত্ত্যর পরোয়ানা পাঠাবে বহুগর্জনে, কে জানে ! সংঘর্ষ যখন শুরু হয়েছে, তখন কোনো কন্দি-কিকির আঁটার পর্বস্ত ফুরসৎ পাওয়া যাবে না।

ইভান্স বললে, ‘খুব সাবধান ! সবাই হামাগুড়ি দিয়ে চলো। যে-কোনো মুহূর্তে ওরা আবার গুলি চালাতে পারে !’

এই কথাই বেন মস্তের মতো কাজ করলে। ইভান্সের কথা শেষ হবার আগেই আরেক দফা বন্দুকের আওয়াজ হ’লো, আর তৎক্ষণাৎ সারভিস কপাল চেপে ধ’রে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গুলি তার কপালে লেগেছে। ঠিক লেগেছেও বলা যায় না, কপাল ছুঁয়ে গেছে, ভিতরে ঢোকেনি, কাজেই আঘাত তেমন মারাত্মক নয়—কিন্তু তা না হ’লে কী হবে—বেশ রক্ত ঝরছে।

আরো সাবধান হ’তে হবে তাদের।

সারভিসকে নিয়েই সবাই এত ব্যস্ত ছিলো যে আশেপাশে কী হচ্ছে তেমন খেয়াল করেনি। হঠাৎ দূরে একটা ঝাপটাঝাপটির শব্দ শুনে সবাই খেয়াল ক’রে ছাখে যে ত্রিয়ারী তাদের সঙ্গে নেই। ত্রিয়ারী কোথায় ? তার সঙ্গেই কি হাতাহাতি হচ্ছে নাকি দস্যুদের ! কী সর্বনাশ ! ওইটুকু ছেলে অত বড়ো জোরান দস্যুদের সঙ্গে পারবে কেন ?

কোনোদিকে না তাকিয়ে ডোনাগান সেদিকে ছুটে গেলো—পিছন-পিছন অস্ত্র সবাই। গরুড়নের পাশ দিয়ে শেঁা ক’রে একটা গুলি ছুটে গেলো—দেখা গেলো অদূরেই রক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। চক্ষুর পলকে ইভান্সের বন্দুক গর্জন ক’রে উঠলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অস্বুতভাবে রক বেন হাওয়ার মিলিয়ে গেলো। ইভান্স তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ছাখে রক যেখানটার ছিলো, সেখানে কোনো বৃত্তদেহই নেই। রক তাহ’লে আবার চম্পট দিয়েছে ! কিন্তু হতভাগা পালালো কোনখান দিয়ে ?

ঝোপের মধ্যে গুদিকে তখন ডোনাগান ট্যাঁচাচ্ছে : ‘ত্রিয়ারী, ছেড়ো না শরতানটাকে ! ছেড়ো না !’

গলার স্বর লক্ষ্য ক’রে তারা সেখানে গিয়ে ছাখে ত্রিয়ারী আর আরেকটা দস্যু—তার নাম কোপ—ভীষণ হট্টোপুটি করছে। ও-রকম তাগড়াই গুণ্ডার সঙ্গে ত্রিয়ারী পারবে কী ক’রে ? কোপ তাকে মাটিতে চেপে ধ’রে একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আর ত্রিয়ারী প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ডোনাগান ততক্ষণে তার সামনে লাকিয়ে প’ড়ে বন্দুক তুলে ধরেছে—কিন্তু

বন্ধুকের ঘোড়া টেপবার আগেই কোপ আচড়িতে ত্রিয়ারকে ছেড়ে ডোনাগানের বুকে ছোরাটা বাঁটলুকু বসিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ হ'য়ে গেলো। টুঁ-শকটিও না ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ডোনাগান।

সারভিসের আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি ব'লে সবাই তখনও দস্যদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার জন্তে থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডোনাগান যেভাবে জখম হয়েছে, তাতে বাঁচবে কি না কে জানে। যেভাবে ক্রমেই নিস্তেত হ'য়ে পড়ছে, তাতে আশা একেবারেই বৃষ্টি নেই। সবাই তৎক্ষণাৎ ডোনাগানকে ধরাধরি ক'রে ফরাশিগুহার দিকে নিয়ে চললো। এই অবস্থার তাড়াতাড়ি যাওয়াও বিপজ্জনক—কাঁকুনি লেগে খারাপও হ'তে পারে, অথচ তাড়াতাড়ি গুফার ব্যবস্থা না করলেও আবার নয়। যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ের তারা তাকে ব'য়ে নিয়ে চললো। কিন্তু ফরাশিগুহার কাছে যাবার আগেই একটা ভীষণ কোলাহল তাদের কানে এসে পৌঁছোলো।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাদের অস্থপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওয়ালস্টোন এসে ফরাশিগুহা আক্রমণ করেছে, তার সঙ্গে রয়েছে ব্র্যান্ড, আর কুক। আরেকটু এগিয়ে তারা চাখে, ওয়ালস্টোন একটা ছেলের টুঁটি টিপে ধ'রে বাইরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা আর কেউ নয়, জাক। তার পিছনে ব্র্যান্ড, সেও একটা ছেলেকে পাকড়েছে—সম্ভবত কোসটার। দস্যরা হড়মুড় ক'রে জীল্যাও রিভারের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আর জাক আর কোসটার ভীষণভাবে চেষ্টা করছে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার।

হঠাৎ বাসটার কোথেকে ছুটে এসে ব্র্যান্ডের উপর লাফিয়ে পড়লো। অমন অতর্কিত আক্রমণে ব্র্যান্ড একটু হকচকিয়ে গেলেও বাসটারের সাধ্য কী তার সঙ্গে এঁটে ওঠে! ব্র্যান্ড এক ঘুমিতেই তাকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে।

ওয়ালস্টোন আর ব্র্যান্ড, আর অপেক্ষা করলে না—নদীর দিকে ছুটলো। নদীতে নৌকোর উপর কুক দাঁড়িয়ে।

একবার যদি তারা নদীর ধারে পৌঁছুতে পারে, তাহ'লে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। জাক আর কোসটারকে নিয়ে তারা তবে বীরার-রক-হারবারে পালিয়ে যাবে, আর তারপর তারাই ছেলেদের জামিন হিশেবে ব্যবহার ক'রে বখেছাচার চালাবে।

ইভান্স, ত্রিয়ার, গরডম, ক্রস আর উইলকিন্স প্রাণপণে মরীয়া হ'য়ে তাদের পিছন-পিছন ছুটলো। গুলি করারও কোনো উপায় নেই, কারণ তাহ'লে আবার জাক আর কোসটারের গায়েও গুলি লাগতে পারে।

তাদের এই অসহায় অবস্থায় আচম্বিতে সাহায্য এলো ঈশ্বরপ্রেরিত। তারা কিছু করতে না-পারলেও আরেকজন এবার তাদের সাহায্য করলে, সে ফ্যান। তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে সে ব্র্যান্ডের উপর কাঁপিয়ে প'ড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরলো। ব্র্যান্ডের সাধ্য কী ফ্যানের সঙ্গে পেরে ওঠে! বাধ্য হ'য়েই সে তখন কোসটারকে ছেড়ে দিয়ে আঙ্গুরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো, আর ওয়ালস্টোনকেও জাককে ফেলে রেখে তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে হ'লো।

এমন সময়ে দেখা গেলো ফরাশিগুহা থেকে আরেকটি লোক ছুটে বেরিয়ে এসেছে। সে ফর্ব্‌স্‌। তাকে দেখেই ওয়ালস্টোন আশ্চর্য হ'য়ে চোঁচিয়ে উঠলো, 'ফর্ব্‌স্‌, শিগগির এসো! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ইভান্‌স্‌ আর সহ করতে পারেনে না, খেমে দাঁড়িয়ে ফর্ব্‌স্‌ের দিকে বন্দুক তাগ ক'রে ধরলো। কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ফর্ব্‌স্‌ ওয়ালস্টোনকে সাহায্য করা দূরে থাক, বাঘের মতো তার উপর কাঁপিয়ে প'ড়ে তার মুখে ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড ঝুসি চালাতে লাগলো।

ওয়ালস্টোন প্রথমটার ভয়াবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সহজে ঝাবড়া-বার পাত্র সে নয়! মুহূর্তের মধ্যে কোমরবন্ধ থেকে একটা মস্ত ছোঁরা বার ক'রে ফর্ব্‌স্‌ের বুকে আঘুল বসিয়ে দিলে। ফর্ব্‌স্‌ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, রক্তে মাটি ভেসে গেলো।

ফর্ব্‌স্‌কে ছেড়ে দিয়ে ওয়ালস্টোন তখন আবার জাককে পাকড়াবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ছেলেমানুষ হ'লেও জাক সেই বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলো। চকিতে জামার মধ্য থেকে পিস্তল বার ক'রে ওয়ালস্টোনের বুকে সে পর-পর গুলি চালিয়ে দিলে।

ব্র্যান্ড্‌ ইতিমধ্যে নৌকায় গিয়ে উঠেছিলো। গুলি খেয়েও টলতে-টলতে ওয়ালস্টোন গিয়ে নৌকায় উঠলো। কুক তৈরিই ছিলো, তখনই সে নৌকো ছেড়ে দিলে।

আর সেই মুহূর্তেই আচম্বিতে যেন বিনা মেঘে বাজ কেটে পড়লো। বাজ ফাঁটার মতোই ভীষণ শব্দে সমস্ত দ্বীপ কেঁপে উঠলো ধর-ধর, আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কামানের গোলা এসে নৌকায় পড়লো।

ফরাশিগুহা থেকে মোকো কামান ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সভয়ে স'রে আসতে-আসতে ছেলেরা দেখতে পেলো, কামানের গোলার নৌকো আর তার আরোহীরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে—আর নদীর মধ্যে স্বস্তের মতো কাঁপ দিয়ে উঠেছে জল।

একটু আলোড়ন, তারপরেই নৌকোর কিছু ভাঙাচোরা কাঠ ভেসে
রইলো জলে—লোকগুলো যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোনো হুঁশই
রইলো না।

মুক্তির উপায়

কেটের অক্লান্ত সেবায় ডোনাগান ধীরে ধীরে সেরে উঠছে, কিন্তু এখনও ভারি
দুর্বল। অথচ একটা সময় এসেছিলো যখন সমস্ত গুহায় শোকের ছায়া নেমে
এসেছিলো। মানুষের রক্তে তার হাত রাঙা হ'য়ে গেছে—এই হাত সে কী
ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার করে? এইসব প্রশ্নই তখন সে করতো বিকারের ঘোরে।

কেট অল্প বয়েস থেকেই অবসর সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের চর্চা করতেন—
ডোনাগানের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার অগ্নিপরীক্ষা হ'য়ে গেলো।

ছেলেরা ফর্ব্‌স্কেও গুহায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তার আঘাত হয়েছিলো
মারাত্মক, তাকে কিছুতেই বাঁচানো গেলো না। মরবার আগে তার একটুক্কণের
জন্মে জ্ঞান ফিরেছিলো। তাকে দুষ্কর্মের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্মে তখন
সে কেটকে আকুলভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো। অশুশোচনায় তার গলা ভারি
আর আতুর হ'য়ে এসেছিলো—ছেলেদের কাছে সে অহুতাপ প্রকাশ ক'রে
মার্জনা ভিক্ষা চেয়েছিলো।

ফ্রান্সোয়া বদোয়ঁর কবরের কাছেই তাকে সমাহিত করা হ'লো। দুটি
ক্রুশচিহ্ন দ্বীপের উপর দুই শোচনীয় মৃত্যুর অভিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু দ্বীপ এখনও সম্পূর্ণ শত্রুশূন্য হয়নি। কোপ আর রক এখনও বেঁচে
আছে। আর ষতদিন তারা স্বাধীনভাবে দ্বীপের উপর চলাফেরা করবে, ততদিন
দ্বীপবাসীরা মোটেই নিরাপদ নয়—যে-কোনো সময়ে বিপদ ঘনিয়ে আসতে
পারে। এটা ঠিক যে ওয়ালস্টোনের মৃত্যুতে তারা হালভাঙা নৌকোর মতোই
বানচাল অবস্থায় পড়েছে, কারণ সেই ছিলো তাদের মাথা। কিন্তু তবু তাদের
আদৌ বিশ্বাস নেই—কখন যে কী ক'রে বসবে, কেউ জানে না।

তাই ডোনাগান একটু সেরে উঠতেই ইভান্স্‌ একদিন গরডন, ব্রিয়ঁ,
বাক্সটার আর উইলকলকে নিয়ে তাদের খোঁজে বেরলো। কোপকে অধিশ্রিত
বেশি ধুঁকতে হ'লো না। ট্র্যাপ-উড়ে ঢুকতেই একটা গাছের তলায় তার
গুলিবিদ্ধ আধপচা মৃতদেহ চোখে পড়লো—তখনও যে তা বুনো জানোয়ারদের

চোখে পড়েনি তা-ই আশ্চর্য। কোপ তাহ'লে ওই সংঘর্ষের সময়েই মারা গেছে।
কিন্তু রক ? অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

‘রকের আশা ছেড়ে ওরা সেদিনকার মতো গুহার ফিরে আসছিলো, হঠাৎ
উইলকল্প বললে, ‘এতসব ঝামেলায় আর তালেগোলে অনেকদিন ফাঁদের
ভিতরটা দেখা হয়নি। একবার দেখা যাক ভিতরে কোনো-শিকার-টিকার
পড়লো কি না।’

এই ব'লে উইলকল্প ফাঁদের ডালপালা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেই
স্তম্ভিত ! তার বিস্মিত চীৎকার শুনে ফাঁদের ভিতরে তাকিয়ে অন্তদেরও
চক্ষুস্থির !

ফাঁদের মধ্যে কোন জন্তু ধরা পড়েনি, পড়েছে স্বয়ং রক। তার দেহে অবিশি
প্রাণ নেই। তখন ইভান্স্ বৃথাতে পারলো পলায়মান রকের পিছনে সে যখন
গুলি ছুঁড়েছিলো, তখন রক কেন অমন অদ্ভুত ও রহস্যময়ভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে
গিয়েছিলো।

যাক, শক্ররা তাহ'লে নিমূল হয়েছে স্বীপ থেকে। এবারে ডোনাগান
আরেকটু সেরে উঠলেই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে দস্যুদের সেই
‘প্লুপ’ নৌকোটা মেরামত করা দরকার।

একদিন ইভান্স্ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বীয়ার-রক-হারবার থেকে
নৌকোটা উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো।

জানুয়ারি মাসের শেষদিকে নৌকোটা তৈরি হ'য়ে গেলো। নৌকোটা
তৈরি হ'য়ে গেলেই প্রথমে তাতে যতটা সম্ভব দরকারি জিনিসপত্র বোঝাই
করা হ'লো। খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, এমনকি লাইব্রেরির বইগুলো পর্যন্ত
বাদ গেলো না। নৌকোটা মস্ত—অনেক জিনিস ধরবে—অতজন মানুষ
গেলেও কোনো অসুবিধে হবে না। ইভান্স্ অবিশি জিনিসপত্রের মধ্যে সবচেয়ে
গুরুত্ব দিলে ছেলেদের নোটের তাড়াকে—ছেলেদের জাহাজের সিন্ধুকে এই
তাড়া-তাড়া নোট ছিলো। দেশে ফেরবার সময় ওই টাকা তাদের সবচেয়ে
কাজে লাগবে।

১৮৬২ সালের এই ফেব্রুয়ারি তারা চারম্যান (ওরোফে হ্যানোভার)
আইল্যান্ড ছেড়ে যাবে ব'লে ঠিক করা হ'লো, ৪ তারিখ বিকেলবেলায় তারা
পোষা জানোয়ারগুলিকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে সব গুণানাকো, ভিকুনা,
অস্ট্রিচ ছড়মুড় ক'রে ছুটে পালালো বনের মধ্যে।

‘হতচ্ছাড়াগুলো কী বেইমান দেখেছো!’ গারমেন্ট বললে, ‘একটা ধস্তবাদ

দেয়ার তরও তাদের সহীলো না ! আরে বাপু, ছেড়েই তো দিচ্ছিলুম—তো অত তাড়া কিসের ?

‘এই হচ্ছে জগতের নিয়ম !’ এমন গম্ভীরভাবে সারভিস কথাটা বললে যে না হেসে আর থাকতে পারলে না কেউ । সারভিস প্রায়ই এইসব আশুবাণ্য আউড়ে তাদের মধ্যে হাস্যরোল তুলে দিতো ।

সে-রাস্তিরে আর কার চোখে ঘুম এলো না ।

এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এতদিন তারা কত চেষ্টাই না করেছে—কিন্তু আজ যখন ছেড়ে যাবার সময় হ’লো, তখন তাদের বড় মন-কেমন করতে লাগলো ।

সত্যি, দিবিয়া ছিলো তারা এই দ্বীপে !

দেশের ডাক

সাল ১৮৬২, তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি, সময় প্রাতঃকাল । জীল্যাও রিভারের উপর দিয়ে তরতর ক’রে একটা মস্ত নৌকো স্কুনার উপসাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, আর নৌকোর গলুইয়ে পাটাতনে কি হালে ব’সে আছে অকল্যাণ্ডের চারম্যান বোরডিঙ স্কুলের ছেলেরা ও যোকো, ইভান্স্ এবং কেট । দেখতে-দেখতে অকল্যাণ্ড হিলের সবচেয়ে উঁচু চূড়োটিও তাদের দৃষ্টির বাইরে চ’লে গেলো ।

সেদিন ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ, সেদিন ভোরবেলায় হঠাৎ সারভিস নৌকোর গলুই থেকে চীৎকার ক’রে উঠলো, ‘ধোঁয়া ! ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে !’

এই ক-দিন সমানে ইভান্সের নির্দেশমতো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাদের নৌকোটি ভেসে গিয়েছে । সমুদ্র বেশ শান্ত, আবহাওয়া ভালো—দেখে কে বলবে যে এই সমুদ্রেরই জল একদিন তাদের জাহাজটা তাড়িয়ে নিয়ে এসে দ্বীপে আছড়ে ফেলেছিলো—অথচ এখন সামান্য নৌকোটাকে যেন আলগোছে রক্ষা ক’রে নিয়ে যাচ্ছে । সমুদ্রের কিছুই ঠিক নেই । এই খুশি, এই রাগে অস্থির ।

সারভিসের চীৎকার শুনে গরডন চটপট জিজ্ঞেস করলে, ‘কার বন্দুকের ধোঁয়া ?’ ইভান্স্ ততক্ষণে চোখে ছুরবিন লাগিয়েছে । বললে, ‘না, একটা স্ত্রীমারের ধোঁয়া ।’

ত্রি’য়া তখন একেবারে মাস্তলের ডগায় উঠে গেছে । সে সোজাসে চেষ্টা করে উঠলো, ‘জাহাজ, একটা জাহাজ !’

একটু পরেই তারা খালি চোখেই দেখতে পেলো, একটা প্রকাণ্ড কালো সদাগরি জাহাজ জল কেটে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

ছেলেরা হাতের কাছে যা পেলো, নিশান ক্রমাল কি গায়ের জামা—সব ওড়াতে লাগলো। জাহাজ থেকে তারই উত্তরে শোনা গেলো বাঁশির শব্দ। নৌকোটা তবে তাদের চোখে পড়েছে! দশ মিনিট পরেই নৌকার সতেরোজন আরোহীকে তাদের মালপত্র-সমেত 'গ্র্যাফটন' জাহাজে তুলে নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দেয়া হ'লো। নৌকোটা ভাসতে-ভাসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

গ্র্যাফটন জাহাজের কাপ্তেনের নাম লঙ। ক্যাপটেন লঙ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বাসছেন। দু-বছর আগেকার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কথা সবাই জানতো, পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিলো। এতদিন পরে সেই হারানো জাহাজের বালক আরোহীদের উদ্ধারের গৌরব লাভ ক'রে ক্যাপটেন লঙ আর নাবিকদের আনন্দের সীমা রইলো না।

জাহাজে তখন দম্বুরমতো হইচই প'ড়ে গেছে। নাবিকদের কে আগে চারম্যান আইল্যাণ্ডের গল্প শোনাবে, তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে আর কি। গতিক দেখে ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'একজন সব গুছিয়ে বলুক।'

অমনি বাস্কার বললে, 'আমিই বলবো। আমি সব আমার রোজনামচাশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি।'

ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'তাই নাকি? তাহ'লে তুমি আমাদের তোমার দিনপঞ্জীটাই না-হয় প'ড়ে শোনাও।'

বলামাত্র বাস্কার তার দিনপঞ্জী বার ক'রে সবাইকে প'ড়ে শোনাতে লাগলো।

তার একটানা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের চোখ স্বপ্নাতুর হ'য়ে উঠলো। সে একেকটা ক'রে ঘটনা বিবৃত করে, আর তাদের চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে চারম্যান আইল্যাণ্ড। স্কুগোল যা-ই বলুক, তাদের কাছে ধীপটা চিরকালই চারম্যান আইল্যাণ্ড থেকে যাবে।

গ্র্যাফটন তখন পূর্ণবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বার-বার কী-এক রহস্যময় উচ্চারণে ফেনিল হ'য়ে উঠছে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরবিসারী নীল কান্তি।

বোধহয় সমুদ্রও বাস্কারের মতো তাদের কোনো গল্প শোনাতে চাচ্ছে।

